প্রথম আলো

টেকসই উন্নয়ন

প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিশ্চিত করা জরুরি

ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা গত পাঁচ দশকে বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০-এর দশকের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের গতিশীল নিম্নমধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে উত্তরণ—এটি কমসংখ্যক দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে সেচ সম্প্রসারণ, উচ্চফলনশীল জাত, যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষিবহির্ভূত খাতের বিস্তার মানুষের জীবনযাত্রা বদলে দিয়েছে। নারীর কর্মসংস্থান, বিশেষত তৈরি পোশাক খাতে, তাঁদের পরিবারে স্থিতিশীল আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে এবং নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক দরিদ্র পরিবারকে আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় অনেক গ্রামীণ পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে, ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগের পথ তৈরি করেছে ও সন্তানদের পড়াশোনায় সহায়তা করেছে।

তবে দারিদ্র্য হ্রাসের এই সাফল্যের স্পষ্ট সীমাবদ্ধতাও আছে। নগর দারিদ্র্য দ্রুত বাড়ছে এবং এর প্রকৃতি আগের তুলনায় বেশি জটিল। খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য মানুষের প্রকৃত আয় কমিয়ে দিয়েছে এবং অনেক পরিবার দারিদ্র্যসীমার ওপর থেকে আবার নিচে নেমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, দারিদ্র্য হ্রাসের সাফল্য কিছু ক্ষেত্রে আবার উল্টো দিকে ঘুরে গেছে।

অন্যদিকে বৈষম্যও ক্রমে স্পষ্টভাবে বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, জাতীয় আয় বণ্টনের জিনি সহগ ২০১৬ সালের শূন্য দশমিক ৪৮২ থেকে ২০২২ সালে বেড়ে শূন্য দশমিক ৪৯৯-এ দাঁড়িয়েছে, যা আয় বণ্টন আরও অসম হয়ে পড়ার ইঙ্গিত দেয়। শহর ও গ্রামের বৈষম্যও বিস্তর। শহরে উচ্চ উৎপাদনশীল সেবা ও শিল্প খাত বিস্তার লাভ করলেও গ্রামে বহু মানুষ কম আয় কৃষি ও অনিয়মিত কাজের ওপর নির্ভর করে চলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকারের বৈষম্য এসব পার্থক্যকে আরও গভীর করছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা নিম্নমানের বিদ্যালয়ে পড়ে, অপুষ্টিতে ভোগে এবং আধুনিক শ্রমবাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ খুব কম পায়। এ কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে।

খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একই ধরনের দ্বৈত বাস্তবতা দেখা যায়। গত তিন দশকে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি করেছে। কৃষিপ্রযুক্তিতে অগ্রগতি এবং সরকারি নীতিতে প্রণোদনা এতে বড় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু খাদ্যনিরাপত্তা কেবল উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করে মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি ও ক্রয়ক্ষমতার ওপরও। জলবায়ু পরিবর্তন এখন এই ব্যবস্থার প্রধান হুমকি। সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, আকস্মিক বন্যা ও খরার কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ কৃষিজমি ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

সামাজিক সুরক্ষায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কাঠামো তৈরি করেছে। ১২০টির বেশি সুরক্ষা কর্মসূচি চালু রয়েছে—বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, খাদ্যসহায়তা, কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি। কিন্তু এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা সীমিত। সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ ২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের মাত্র ১ দশমিক ৮৭ শতাংশ। তবে এই বরাদ্দের মধ্যে এমন অনেক উপাদান

বাংলাদেশ বহুবার প্রমাণ করেছে যে অত্যন্ত কঠিন অবস্থা থেকেও দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। এখন প্রয়োজন সেই অগ্রগতিকে আরও ন্যায়সংগত ও স্থিতিশীল ভিত্তিতে দাঁড় করানো—যাতে দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রবৃদ্ধির সুফল বাস্তবে অনুভব করতে পারেন

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মূলত দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক নয়, যেমন সরকারি কর্মচারীদের পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ প্রদান ও কৃষি ভর্তুকি। এসব উপাদান বাদ দিলে ২০২৬ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দের প্রকৃত অংশ জিডিপির মাত্র ১ দশিমক শূন্য ৩ শতাংশে নেমে আসে। এই বরাদ্দ বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তার ওপর লক্ষ্যভ্রষ্টতা, উপকারভোগী তালিকা হালনাগাদ না হওয়া, কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি এবং নগর দরিদ্র ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের বাদ পড়া—এসব কারণে সুরক্ষার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই সুরক্ষাকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে ডিজিটাল রেজিস্ট্রি, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা তালিকা, সঠিক লক্ষ্যভিত্তিক বরাদ্দ এবং নগর দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় জিডিপির কমপক্ষে ৪ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

এখন বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যকে বহুমাত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে জোর দিয়ে বলা হয় যে দারিদ্র্য কেবল আয়ঘাটতির বিষয় নয়; এটি একাধিক বঞ্চনার সমষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের শিক্ষা, নিরাপদ বাসস্থানের অভাব, অপুষ্টি, পরিষ্কার জ্বালানির সুযোগ না পাওয়া ও সামাজিক বর্জন। লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামাজিক শ্রেণি—এসব উপাদানই নির্ধারণ করে কারা দারিদ্র্যের মধ্যে রয়ে যায়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাংলাদেশের দ্বৈত বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশটি দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভিত্তি এখনো দুর্বল। এখানে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকলেও যেকোনো আঘাতে নিচে নেমে যেতে পারে। এখন বাংলাদেশের জন্য শুধু প্রবৃদ্ধির গতি নয়; বরং তার গুণগত মান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক।

এ জন্য দরকার শিক্ষায় ও দক্ষতায় বড় বিনিয়োগ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রগতিশীল করব্যবস্থা, খাদ্যবাজারে স্বচ্ছতা, জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ ইত্যাদি। দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ ও খাদ্যনিরাপত্তা—এগুলো আলাদা নয়; একটি সমন্বিত উন্নয়নব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়নের অংশ। বাংলাদেশ বহুবার প্রমাণ করেছে যে অত্যন্ত কঠিন অবস্থা থেকেও দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। এখন প্রয়োজন সেই অগ্রগতিকে আরও ন্যায়সংগত ও স্থিতিশীল ভিত্তিতে দাঁড় করানো—যাতে দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রবৃদ্ধির সুফল বাস্তবে অনুভব করতে পারেন।

ফাহমিদা খাতুন নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত-তালেবান নতুন ঘনিষ্ঠতার রহস্য যেখানে

আজিজা মুখাম্মেদোভা ও রায়খোনা আবদুল্লায়েভা

এ বছরের ১০ অক্টোবরের কথা। সেদিন নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ভারত ও তালেবানের মধ্যে প্রথম উচ্চপর্যায়ের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক। বৈঠকে ভারত ঘোষণা করে, কাবুলে ২০২২ সালের জুন থেকে চালু থাকা তাদের টেকনিক্যাল মিশনকে এখন দূতাবাসে উন্নীত করা হবে।

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর ভারত-আফগান সম্পর্কের ধরন ইতিবাচকভাবে বদলেছে। যদিও ভারত এখনো তালেবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। মিশনকে দূতাবাসে উন্নীত করা মানে স্বীকৃতির প্রস্তুতি নয়, বরং বাস্তবতার নিরিখে সম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল। অর্থাৎ ভারত তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়েও সর্বোচ্চ মাত্রায় যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ বজায় রাখতে চায়।

আফগানিস্তান প্রশ্নে ভারত অর্থনৈতিক ও মানবিক সহায়তাকে প্রভাব বিস্তার করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আফগানিস্তানের জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য কর্তৃপক্ষ জানায়, দেশটির বাণিজ্যে একমাত্র বড় অংশীদার দেশ—যার সঙ্গে সব সময় বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকে, সেটি হচ্ছে ভারত।

২০২২-২৩ অর্থবছরে আফগানিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল ১৪৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ সালে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩১ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলারে। ওই সময়ে আফগানিস্তান ভারতের কাছ থেকে ২৬৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে এবং ৫৯৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান ভারতের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছে। এমনকি তা চীন, ইরান বা পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। ফলে ভারতের ওপর আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক নির্ভরতা আরও বেড়েছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ফলে ভারত সেখানে ভূরাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে পারছে, আবার একই সঙ্গে রাজনৈতিক দূরত্বও বজায় রাখছে। অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক প্রকল্পের বাইরে ভারত মানবিক কূটনীতিকেও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারত আফগান জনগণের জন্য ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে। ভারত বর্তমানে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় মানবিক সহায়তাদাতা দেশ। তাদের সহায়তার মধ্যে ৫০ টন চিকিৎসা সরঞ্জাম, ৬ কোটি ডোজ টিকা, ৪০ হাজার টন গমসহ বিভিন্ন মানবিক সহায়তা রয়েছে।

ভূরাজনৈতিক সমীকরণ

আফগানিস্তানে ভারতের কার্যক্রমের পেছনে মূল প্রেরণা হলো চীন ও পাকিস্তানের মতো অন্যান্য শক্তির প্রভাব সেখানে সীমিত করা। ২০২৫ সালের অক্টোবরে মুত্তাকির ভারত সফরের সময়ই আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনা বাড়ে। এ পরিস্থিতি দিল্লিকে সুযোগ দেয় তাদের কূটনৈতিক অবস্থান আরও শক্ত করার।

পরিস্থিতি আরও জটিল দিকে মোড় নেয় ১১ নভেম্বর ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলার পর, যা চরম অবনতি ঘটায় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ওই হামলার জন্য 'ভারতপন্থী গোষ্ঠী' এবং তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি), অর্থাৎ পাকিস্তানি তালেবানকে দায়ী করে। পাকিস্তান বহুদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে আফগান তালেবান টিটিপিকে নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে।

এর আগে গত ৯ অক্টোবর আফগানিস্তান-পাকিস্তান সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ আফগানিস্তানকে 'ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি' বলে মন্তব্য করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও অভিযোগ করেন যে ভারত তালেবানকে 'উসকে দিচ্ছে'।

দিল্লি সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে। ছবি: রয়টার্স

এ বাস্তবতা ভারতের জন্য উদ্বেগজনক, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্যের সম্ভাব্য নতুন পুনর্বিন্যাস নিয়ে। এর প্রধান কারণ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। এ সম্পর্কের পেছনে বড় সমর্থন আছে চীনের। চীন কার্যকরভাবে ঢাকা-ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়কে উৎসাহ দিচ্ছে। ভারতের কাছে এটি একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি। কারণ, এই নতুন আঞ্চলিক সমীকরণ দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশেষ করে আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব দুর্বল করতে পারে।

নতুন আঞ্চলিক শক্তিকাঠামো

একই সময়ে চীন পাকিস্তানের সঙ্গে তার কৌশলগত সম্পর্ক আরও গভীর করছে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই) এবং 'চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর' (সিপিইসি) প্রকল্পের মাধ্যমে। এসব প্রকল্প দুই দেশের অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক সংযোগকে শক্তিশালী করছে এবং পরিবহন-বাণিজ্য রুট থেকে ভারতকে কার্যত বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। চীন-পাকিস্তান সহযোগিতা যখন যৌথভাবে একই গন্তব্যের দিকে আগানোর পর্যায়ে চলে যায়, তখন তা ভারতের জন্য ভূ-অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি তৈরি করে।

এই রাজনৈতিক সমীকরণে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে তোলা আর শুধু প্রভাব বিস্তারের কৌশল নয়। এটি ভারতের জন্য একধরনের বেঁচে থাকার কৌশল, যার মাধ্যমে তারা মধ্য এশিয়ায় প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে চায় এবং চীন-পাকিস্তান অক্ষের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান শক্ত রাখতে চায়।

তবে ভারত ও তালেবানের মধ্যে সহযোগিতা এখনো সীমিতই রয়ে গেছে। নারী অধিকারসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ভারত এখনো তালেবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এর একটি প্রতীকী উদাহরণ হলো ১০ অক্টোবর দুই দেশের মন্ত্রীদের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, যা ভারতের গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।

স্বল্প মেয়াদে ভারত রাজনৈতিক স্বীকৃতি না দিয়েই আফগানিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও মানবিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চাইবে এবং বর্তমান সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের অপেক্ষায় থাকবে। এ অবস্থান ভারতের জন্য ঝুঁকি কমিয়ে আনে, একই সঙ্গে আফগানিস্তানকে তার প্রভাববলয়ের মধ্যে রাখার সুযোগ দেয়।

● **আজিজা মুখাম্মেদোভা ও রায়খোনা আবদুল্লায়েভা**
ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অধীন আফগানিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়া অধ্যয়ন কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ গবেষক

দ্য ডিপ্লোম্যাট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম আলো

তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে অভিবাসন স্থগিতের পরিকল্পনা ট্রাম্পের

অভিবাসন

ট্রাম্পের এ পদক্ষেপ যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি, শিক্ষা বা নিজ দেশের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে যান, এমন লাখ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করবে।

- ১৯টি দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা নাগরিকদের গ্রিনকার্ড পর্যালোচনা করে দেখার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
- আফগান নাগরিকদের অভিবাসন আবেদন প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

ডোনাল্ড ট্রাম্প

তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে অভিবাসন স্থগিত করার পরিকল্পনা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে একজন আফগান নাগরিক দুজন ন্যাশনাল গার্ড সেনাকে গুলি করায় গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন।

ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর প্রশাসন সব 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' থেকে অভিবাসন 'স্থায়ীভাবে স্থগিত' করবে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তা স্পষ্ট করেননি।

ওয়াশিংটনে গত বুধবারের ওই গুলির ঘটনার পর ট্রাম্প অভিবাসনবিষয়ক যে পদক্ষেপগুলো নিতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর মন্তব্য সেটির তীব্রতা নির্দেশ করছে। এ ধরনের পদক্ষেপে ব্যাপক বৈশ্বিক প্রভাব পড়বে। যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি, শিক্ষা বা নিজ দেশের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে যান, এমন লাখ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করবে।

ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করার জন্য আমি সব তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব।'

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বুধবারের হামলা চালিয়েছিল এক আফগান নাগরিক, যিনি ২০২১ সালে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়ে লিখেছেন, তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের আমলে দেওয়া 'লাখ লাখ' অভিবাসনের অনুমোদন বাতিল করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত সম্পদ নন, এমন যে কাউকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

এ পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে ১৯টি দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা নাগরিকদের গ্রিনকার্ড পর্যালোচনা করে দেখার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা বিভাগের (ইউএসসিআইএস) প্রধান জোসেফ এডলো বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ঝুঁকিপূর্ণ বা উদ্বেগের তালিকায় থাকা ১৯টি দেশ থেকে আসা প্রত্যেক নাগরিকের গ্রিনকার্ড কঠোরভাবে পর্যালোচনা করতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ওয়াশিংটনে গুলি

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দায়িত্বরত দুই ন্যাশনাল গার্ডকে গুলি করা হয়। তাঁরা হলেন সারা বেকস্ট্রম ও অ্যান্ড্রু উলফ। তাঁরা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য। এর মধ্যে সারা বেকস্ট্রম মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর একটি অংশ ন্যাশনাল গার্ড। কোনো অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ও দেশের প্রেসিডেন্ট, দুজনের অধীনেই কাজ করে এই বাহিনী। তদন্ত কর্মকর্তারা বলেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল, বয়স ২৯ বছর। রহমানুল্লাহ ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি 'অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম' প্রকল্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা জানিয়েছে, তারা সব আফগান নাগরিকের অভিবাসন আবেদন প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের এখন আফগানিস্তান থেকে আমাদের দেশে প্রবেশ করা প্রতিটি এলিয়েনকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।'

পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে মানানসই নয়

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন, এমন ব্যক্তিদের জন্য সব ফেডারেল সুবিধা ও সহায়তা বন্ধ করার হুমকিও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি আরও বলেছেন, নিরাপত্তার ঝুঁকি বা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে মানানসই নয়, এমন যেকোনো বিদেশি নাগরিককে দেশত্যাগে বাধ্য করবেন তিনি।

এদিকে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের দেশটিতে প্রবেশের সুযোগ দিতে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে ওয়াশিংটনকে অনুরোধ করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের উপমুখপাত্র ফারহান হক বলেন, 'আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রসহ সব দেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের অধীনে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে।'

১৯টি দেশের গ্রিনকার্ড পর্যালোচনা

ইউএসসিআইএসের প্রধান জোসেফ এডলো জানান, যে ১৯টি দেশের গ্রিনকার্ড পর্যালোচনা করা হবে, সে তালিকাটি গত জুন মাসে ট্রাম্প তাঁর নির্বাহী আদেশে উল্লেখ করেছিলেন। এই ১৯টি দেশের মধ্যে ট্রাম্পের ওই আদেশ অনুযায়ী ১২টি দেশের প্রায় সব নাগরিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যার মধ্যে আফগানিস্তান অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলো হলো আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো-ব্রাজাভিল, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। ট্রাম্প আরও সাতটি দেশের ভ্রমণকারীর ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সেগুলো হলো বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান ও ভেনেজুয়েলা।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ কোনগুলো

এনডিটিভি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের ধারণাটি এসেছে স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে, যখন বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত পশ্চিমা ব্লক এবং বামধারার পূর্বাঞ্চলীয় ব্লকের মধ্যে বিভক্ত ছিল। নিরপেক্ষ দেশগুলো ও বাকি দেশগুলোকে তখন তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে একত্র করা হয়েছিল। সাধারণত দরিদ্র বা 'অনুন্নত' দেশ বোঝাতে থার্ড ওয়ার্ল্ড বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ শব্দটি ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে একে ব্যাপক পুরোনো ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে প্রথম বিশ্ব বলতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বোঝানো হতো। দ্বিতীয় বিশ্ব বলতে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণির নেতৃত্বাধীন বামধারার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে আর তৃতীয় বিশ্ব বলতে এই দুই ব্লকের কোনোটির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়—এমন অধিকাংশ দেশকে বোঝানো হতো।

প্রথম বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলকেও এই দলে ধরা হতো—যেমন স্পেনের অধীনে থাকা পশ্চিম সাহারা, বর্ণবৈষম্য আমলের দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা (বর্তমান নামিবিয়া)। এ ছাড়া অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক ১৯৭৫ সালে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার আগপর্যন্ত পর্তুগালের শাসনে ছিল। সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোও কার্যত প্রথম বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো ও পূর্ব ইউরোপ—যার মধ্যে পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া ও বলকান অঞ্চল ছিল—এ ছাড়া চীনের সঙ্গে যুক্ত এশীয় কমিউনিস্ট দেশগুলোও এতে পড়ত, যেমন মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া।

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাকি সব দেশ—মূলত আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলো।

গাজাকে ধীরে ধীরে গিলছে ইসরাইল

যুগান্তর ডেস্ক

গাজাকে ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। গত দুই বছরের বেশি সময় অমানবীয় নৃশংসতার পর এবার গাজা দখলে নেমেছে তেল আবিব। পুনর্গঠনের নামে গাজায় এখন নিজেদের আধিপত্য আরও জোরদারের পরিকল্পনা করছে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে গাজাকে কার্যত দুভাগে ভাগ করতে চাচ্ছে দখলদাররা। বুধবার 'গ্রিন সিটি' ও 'অ্যালটারনেটিভ সেফ কমিউনিটিস' নামে নতুন আবাসন কম্পাউন্ড বানানোর পরিকল্পনার কথা সামনে এসেছে। এতে করে একটু একটু করে গাজাবাসীর ভূমি চলে যাচ্ছে ইসরাইলের দখলে। মিডল ইস্ট আই।

অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের সেনারা যে অংশ (ইয়োলো লাইন) নিয়ন্ত্রণ করে, শুধু সেই এলাকায় নির্মাণ হচ্ছে। গাজার পশ্চিমাঞ্চল, যেখানে অধিকাংশ ফিলিস্তিনি থাকে, সেখানে পুনর্গঠন পুরোপুরি বন্ধ। ফলে ধারণা করা হচ্ছে—ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে না। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটি বর্তমানে গাজার ৫০ শতাংশেরও বেশি। প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, এই পরিকল্পনা পরিচালনা করছেন মার্কিন কর্মকর্তাদের একটি দল এবং সাবেক ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সির সদস্যরা। আরিয়ে লাইটস্টোন, ট্রাম্প প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তা হিসাবে এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। লাইটস্টোনের দলে কিছু নাম না জানা ইসরাইলি ব্যবসায়ীও আছেন।

প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, রাফাহ এলাকায় (মিসরের সীমান্তে) প্রথম আবাসন কম্পাউন্ড তৈরির জন্য ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা শুরু হবে। ধ্বংসস্তূপে টানেল, বিস্ফোরক বা মানবদেহ পাওয়া গেলে, পরিষ্কারে কয়েক মাস লাগতে পারে। প্রিফ্যাব্রিকেটেড ঘর বসাতে আরও ৬৯ সপ্তাহ লাগবে। তবে এখানে অর্থনৈতিক সমস্যাও রয়েছে। প্রিফ্যাব্রিকেটেড ঘর বানাতে কোটি কোটি ডলার লাগবে, কিন্তু এখনো নিশ্চিত কোনো অর্থায়ন নেই। ট্রাম্প প্রশাসন গাজা পুনর্গঠনের জন্য সরকারি অর্থ দেয়নি। তারা চাইছে উপসাগরীয় দেশগুলো বিনিয়োগ করুক।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, যুদ্ধবিরতি থাকলেও গাজায় গণহত্যা বন্ধ করেনি ইসরাইল। ইসরাইলি সরকারের উদ্দেশ্যেও কোনো পরিবর্তন নেই। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টির মহাসচিব আগনেস ক্যালামার্ড বলেন, 'যুদ্ধবিরতির কারণে মনে হতে পারে গাজায় জীবন স্বাভাবিক হচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। হামলা কিছুটা কমেছে, সামান্য ত্রাণ ঢুকছে—তবুও গণহত্যা চলছে।' অ্যামনেস্টি আরও বলেছে, ইসরাইল এখনো খাবার, পানি, আশ্রয়, পোশাক ও স্যানিটেশন সরঞ্জাম গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে না, যা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের জানুয়ারি ২০২৪ এর আদেশের লঙ্ঘন। তাদের ভাষায়, ইসরাইলের এসব নীতি 'ফিলিস্তিনিদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে'। কারণ, গাজায় তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি ও মৌলিক জিনিস পাচ্ছে না।

ইসরাইলি হামলায় সিরিয়ায় নিহত ১৩ : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের বিভিন্ন এলাকায় ভোররাতে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। দখলদার বাহিনীর নতুন অভিযান ও হামলায় সিরিয়ার অন্তত ১৩ নাগরিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া সংঘর্ষে কয়েকজন ইসরাইলি সেনাও আহত হয়েছে। শুক্রবার সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সানা জানিয়েছে, ইসরাইলের স্থল অভিযান ও গোলাবর্ষণে দামেস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর বেইত জিন এলাকার বহু পরিবার ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া পুরো এলাকাজুড়ে ইসরাইলি ড্রোন টহল দিতে দেখা গেছে। আল-জাজিরা জানিয়েছে, বেইত জিনকে লক্ষ্য করে ইসরাইলের আর্টিলারি ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আরও কয়েকজন নিহত ও আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযানে ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ইসরাইলি সূত্র জানিয়েছে, তাদের দুই সেনাসদস্য আহত এবং দুজন সিরীয় বেসামরিক নিহত হয়েছেন। বেইত জিনে প্রবেশ করা ইসরাইলি বাহিনীকে স্থানীয়রা ঘেরাও করলে বিমান ও আর্টিলারি হামলা চালিয়ে তাদের সরিয়ে আনা হয়। এতে সিরীয়দের প্রাণহানি আরও বেড়েছে। পরবর্তীতে জানা যায়, ছয় ইসরাইলি সেনা আহত হয়েছে এবং তাদের তিনজনের অবস্থা গুরুতর। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর ইসরাইল দক্ষিণ সিরিয়ায় দখল ও নিয়ন্ত্রণ আরও সম্প্রসারণ করেছে।

Is Bangladesh's digital transformation deepening a new architecture of inequality?

Bangladesh's digital future will depend on whether the country can transform its digital growth model into a foundation for shared prosperity rather than a new architecture of inequality

writes
Matiur Rahman

Bangladesh's rapid socio-economic transformation is often celebrated as one of the most compelling success stories in the Global South. The rise of the ready-made garment industry, the expansion of mobile banking and digital finance, the push toward technology-enabled services, and the ambition to build a modern, knowledge-oriented economy have created a sense of accelerating progress. Yet beneath this optimistic narrative lies a more complex and less visible story-one that concerns the deepening patterns of inequality produced by the digital transition itself.

The inequality unfolding today is not simply an extension of older divides. It reflects a restructuring of power through digital systems, new knowledge hierarchies, technological access barriers, and ideological narratives that determine who benefits from digitalisation and who is left behind. These emerging patterns cannot be understood solely through traditional measures of income or wealth. They are embedded in socio-epistemic structures that shape how individuals acquire knowledge, participate in networks in an increasingly technology-dependent society.

A sophisticated lens for understanding this dynamic is offered by Bolivian sociologist and data theorist Ricardo Alonzo FernándezSalguero. In his 2025 work, "A Synthetic Theory of Socio-Epistemic Structuration: Capital, Ideology, and Agency in the Age of Digital Inequality", Salguero argues that inequality in the digital era is shaped by the interplay of material capital, epistemic capital, and ideological power. His framework is especially relevant for Bangladesh as the country continues to push forward with its digitalisation drive.

Salguero's core argument is that inequality today operates through dual structures. Material capital still matters, but epistemic capital-the ability to acquire, interpret, and strategically deploy digital knowledge-has become the decisive determinant of social mobility. This includes proficiency in global languages, familiarity with digital platforms, access to networks, and the capacity to shape narratives about innovation and progress. In Bangladesh, where digital expansion is rapid but uneven, epistemic capital has emerged as the sharpest line dividing those who benefit from the transition from those who remain marginalised.

This marks a shift from older patterns of stratification based primarily on land, income, or assets. While these factors remain influential, they no longer fully capture the dynamics of upward mobility. The current digital landscape in Bangladesh shows that access to devices, internet connectivity, or platforms does not necessarily translate into real empowerment. Instead, cognitive capacity, cultural orientation, and ideological framing determine who can convert digital tools into meaningful opportunities.

The ready-made garment sector offers a microcosm of this paradox. Millions of women from rural areas migrate to industrial cities seeking better livelihoods. They form the backbone of Bangladesh's export economy and contribute significantly to national growth. With the expansion of affordable smartphones, many now possess devices that could serve as gateways to financial literacy, online education, and digital entrepreneurship. Yet, for most, these devices remain tools for communication or entertainment rather than instruments of empowerment.

This gap is structural rather than individual. Salguero identifies this as a failure in socio-epistemic structuration. Workers are materially included in the economy but remain excluded from the epistemic structures necessary for strategic digital agency. They have physical access to technology but lack the cognitive, educational, and institutional support required to benefit from it. Their participation is visible, yet their empowerment remains limited.

Urban, English-proficient youth in sectors like ICT, e-commerce, software development, fintech, and global freelancing occupy the opposite pole. They enjoy the advantages of both material and epistemic capital. They grow up in environments that foster digital fluency, exposure to global media, and access to mentors, networks, and high-speed connectivity.

This dual advantage enables them to shape markets, influence policy, and secure high-value opportunities. Their narratives of success are often used as evidence of inclusive digital progress. But their achievements reflect an accumulation of structural privileges that remain inaccessible to many. Digital inequality here is not merely technological-it is fundamentally cognitive and ideological.

Education intensifies these divides. Students in English-medium or elite urban private schools absorb epistemic capital almost effortlessly. They encounter digital platforms early, solve problems in dynamic learning environments, and develop the confidence required to navigate international spaces. Their trajectory naturally aligns with globalised digital labour markets.

In contrast, rural and government-school students experience limited and uneven exposure to digital learning. Even when devices or connectivity are introduced, teaching methods often remain mechanical and disconnected from the skills needed for genuine digital participation. As a result, opportunities in freelancing, remote work, start-up ecosystems, and digital entrepreneurship become stratified before young people even reach adulthood.

Mobile financial services present similar contradictions. Platforms such as bKash, Nagad, and Rocket are frequently cited as examples of financial inclusion. Their reach is impressive, yet their usage patterns reveal deep disparities. Urban professionals use these tools for investment, savings, digital commerce, and wealth planning, while rural households use them primarily for remittance transfers. The difference is not access but strategic capacity.

Without financial education, digital literacy, and exposure to long-term planning, the transformative potential of mobile finance remains concentrated within a narrow elite. Digital access without cognitive empowerment simply reproduces old inequalities under new technological conditions.

Ideology plays a subtle but powerful role in reinforcing these patterns. The national digital transformation agenda celebrates start-ups, fintech innovation, and youth entrepreneurship. These narratives highlight the achievements of digitally fluent urban professionals while rendering invisible the structural challenges faced by others. The discourse promotes an implicit hierarchy that legitimises the privileges of the digitally empowered and obscures the systemic barriers confronting the digitally excluded.

The gig economy provides a particularly revealing example. Online platforms claim to be open, merit-based systems. Yet those who succeed are typically equipped with advanced English proficiency, strong digital portfolios, algorithmic literacy, and socio-cultural flexibility. Those without these skills are often confined to low-wage, low-skill tasks that offer little mobility. The digital labour market is therefore stratified not by access alone but by epistemic capital.

Gender overlays these inequalities in profound ways. Women constitute a major force in Bangladesh's economy, especially in the informal and garments sectors, yet their participation in high-value digital sectors remains limited. Restrictive social norms, unequal access to education, constraints on mobility, and limited exposure to technology prevent many women from acquiring the digital competencies needed to enter emerging professions. While urban middle-class women are increasingly entering ICT roles, rural and low-income women continue to face structural barriers. Digitalisation thus intersects with gender to produce multilayered inequalities.

Rural-urban migrants represent another group caught in this structural divide. Their labour sustains major cities, yet their participation in the digital economy remains minimal. Their employment is typically informal, insecure, and low-paid, with limited opportunities for digital upskilling.

Salguero's theory helps explain why these inequalities persist and deepen. Inequality is recursive: those who possess both material and epistemic capital shape institutions in ways that reproduce their advantages. In Bangladesh, private universities, elite schools, well-funded tech incubators, corporate ecosystems, and urban innovation hubs create environments that favour those who already have the prerequisites for digital success. These structures define what counts as knowledge, whose expertise is valued, and whose presence is marginalised.

Bangladesh is now at a crucial juncture. The digital transition is expanding rapidly, but without deliberate policy intervention, the socio-epistemic divide will widen further. Reducing this divide requires more than expanding connectivity or distributing devices. It calls for embedding cognitive digital competencies into the national education system, reimagining skills development as a lifelong process, and ensuring that marginalised groups can participate meaningfully in the digital economy.

Strengthening digital literacy through public institutions, promoting community-based technology hubs, supporting women's digital leadership, expanding rural innovation centres, and protecting gig workers through inclusive labour policies are essential steps. Equally important is ensuring that the digital economy recognises and values diverse forms of knowledge rather than privileging only those aligned with global corporate cultures.

If Bangladesh is to build a technology-driven future that is equitable and inclusive, it must democratise not only access to technology but also access to epistemic power. Simply providing the tools of digital participation is not enough. Individuals must have the cognitive, cultural, and institutional support to use these tools as pathways to empowerment rather than reinforcement of existing hierarchies.

The true challenge of the digital transition is not technological. It is social, cognitive, and ideological. Bangladesh's digital future will depend on whether the country can transform its digital growth model into a foundation for shared prosperity rather than a new architecture of inequality.

Dr Matiur Rahman is a researcher and development professional.
matiurrahman588@gmail.com

Why Bangladesh fails to diversify its exports

Thus far, the range of exportable goods remains critically narrow, which is why non-apparel products have struggled to gain significant traction in new markets. When the list of products is small, the list of markets naturally stays small too

writes
Syed Muhammed Showaib

It is never wise to put all eggs in one basket where a single misstep can cause them all to break. A nation's "basket" is its export profile and over-reliance on a single sector makes it vulnerable to volatile global demand. Yet despite decades of discussion and repeated calls for diversification, Bangladesh's export structure has shifted very little since it first entered global markets. The decline of jute and jute goods from their once-dominant position did not trigger any meaningful broadening of the export base either. Instead, export concentration simply shifted to a narrow set of new products.

Today, a handful of goods make up most of the export basket and a limited number of markets continue to absorb the bulk of what Bangladesh sends abroad.

Over the past few decades, readymade garments came to define Bangladesh's export identity and it still influences where Bangladeshi products can reach. While some nations have moved away from apparel manufacturing and now import from Bangladesh, many others still produce their own garments and have limited demand for our supplies. But because the garment sector already guarantees a dependable global market, they draw most of the focus, leaving other exportable products without the push they need to grow. Until new products establish themselves, the expansion of destinations will continue to be limited. It is in this context that the recent gains in a few non-traditional sectors should be judged. Rather than signalling a sudden transformation, these trends highlight how long Bangladesh has waited for industries beyond apparel to gain a solid foothold. The toy industry and the wider plastics sector provide examples of what might have emerged much earlier and on a much bigger scale had there been sustained investment and consistent policy commitment.

Recent figures show that toy exports could grow more than eightfold within the next five years, a pace that would have seemed unthinkable not long ago. In 2022-2023, toys from Bangladesh reached 88 countries and earned more than US$75 million. Projections now suggest that by 2030 this amount could climb to nearly $470 million. If Bangladesh stays on this path, it could even break into the ranks of the world's top 30 toy exporters soon. At home, plastics now serve a massive domestic market worth Tk 400 billion. The industry contributes about Tk 35 billion in annual revenue and supports nearly 5,000 factories, most of which are small and medium enterprises that form the backbone of our local economy. This goes to show that there are industries in Bangladesh with genuine potential, ready to grow if given the right support.

That said, the success of toys and plastic, impressive as it is, doesn't change the fact that they remain isolated examples within an export basket still heavily dominated by one sector. The clearest evidence of this is that readymade garments continue to account for more than 82 per cent of export earnings. Policymakers and business leaders have acknowledged the need for a broader product base and more diverse destinations but this shift has not taken place.

Businesses have simply responded to the incentives and market conditions in front of them, and those conditions have kept garments at the centre of the export earnings.

This overconcentration doesn't stop with products but it extends to markets as well. Nearly two thirds still go to Europe and the United States for reasons understandable. According to the Export Promotion Bureau, 44 per cent of all exports go to the European Union alone because tariff-free and quota-free access is still available for least developed countries. Even as Bangladesh achieved a record $48 billion in exports last year, the share going to these two markets declined only slightly from 65 per cent to 62 per cent over three years. Taken together, these trends show how firmly set our reliance has become. A few emerging sectors, promising as they are, cannot change this underlying vulnerability. Without real diversification, Bangladesh will continue to depend on a small and fragile group of markets which keeps the economy exposed in ways that have persisted for years.

Thus far, the range of exportable goods remains critically narrow, which is why non-apparel products have struggled to gain significant traction in new markets. When the list of products is small, the list of markets naturally stays small too, no matter how often diversification is discussed. This basic issue also explains why cash incentives for non-traditional exports have yielded only modest results. Today, these incentives cover more than 40 products, with garment exporters receiving an additional two per cent for shipments beyond the main markets of Europe, North America and the UK. Yet analysts are far from unanimous on how effective these measures really are. Because garments dominate the export structure so heavily, most of the incentives inevitably end up in that single sector. Many experts argue that support should instead target specific products and specific destinations where progress can be clearly tracked, rather than being shaped by pressure from powerful industry groups.

Outside the garment sector, most industries face a different set of challenges. Many struggle to meet international quality and certification standards while weak domestic testing and accreditation systems slow down market entry and drive up costs. High logistics expenses, chronic congestion and inefficient transport networks further weaken competitiveness. On top of that, the absence of free trade agreements blocks access to lower tariff rates in potential new markets. These barriers must be removed.

The journey towards a more diverse export economy is challenging but it cannot be avoided. If Bangladesh wants lasting economic stability, the vision of diversification must move beyond rhetoric and translate into decisive action. The rise of the toy industry is a proof that steady effort can pay off. Applying the same commitment to other promising sectors is the surest way to build a balanced and resilient export future.

showaib434@gmail.com

ইমরান খান কি জীবিত প্রমাণ চান ছেলে

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পাকিস্তানের কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে নিয়ে গুজব, গুঞ্জনে কয়েক দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ শোরগোল চলছে। তাঁকে দেশটির পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিণ্ডির আদিয়ালা কারাগারের ভেতরে হত্যা করা হয়েছে বলে সূত্রের বরাত দিয়ে আফগান একটি গণমাধ্যমের খবর প্রকাশের পর এ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে ওঠে। এবার ইমরানের ছেলে কাসিম খান তাঁর বাবার জীবিত থাকার প্রমাণ চেয়েছেন এবং পিটিআইয়ের এই শীর্ষ নেতাকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এক্সে দেওয়া পোস্টে কাসিম বলেছেন, তাঁর বাবার ৮৪৫ দিন ধরে কারাগারে এবং গত দেড় মাস ধরে তাঁকে ফাঁসির আসামিদের জন্য বরাদ্দ নির্জনকক্ষে রাখা হয়েছে, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তাঁর ভাষায়, 'ছয় সপ্তাহ ধরে তাঁকে একটি মৃত্যুকুঠুরিতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। আদালতের আদেশ সত্ত্বেও তাঁর বোনদের প্রতিবার দেখা করার সময় বাধা দেওয়া হয়েছে। কোনো ফোনকল নেই, কোনো দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনো খবর নেই। আমার ভাই ও আমি কোনোভাবেই আমাদের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।' ২৬ বছর বয়সী কাসেম পোস্টে এসব লিখেছেন বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

এ ইমরানপুত্রের অভিযোগ, বাবার ব্যাপারে তাদের 'পুরোপুরি আঁধারে' রাখা হয়েছে, যা কোনো 'নিরাপত্তাসংক্রান্ত আচরণবিধির' অংশ হতে পারে না।

আদিয়ালা জেল সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন ইমরানের বোন আলেমার

আদিয়ালা জেল সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন আলেমার : ইসলামাবাদ হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে আদিয়ালা জেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং অন্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার আবেদন করেছেন ইমরান খানের বোন আলেমা খানম। এর আগে কারাবন্দি ইমরানের সঙ্গে তাঁর স্বজনদের সপ্তাহে দুবার সাক্ষাতের সময়সূচি পুনর্বহাল করেছিলেন হাইকোর্ট।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি এবং পিটিআইয়ের আরো বেশ কয়েকজন নেতার আদিয়ালা কারাগারের বাইরে গত বৃহস্পতিবার রাতভর অবস্থান কর্মসূচি পালন করার পর গতকাল শুক্রবার মামলার এই আবেদন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার অষ্টমবারের মতো ইমরানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সোহেলকে দেখা করতে দেয়নি কারা কর্তৃপক্ষ। এর আগে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় তাঁর বোনরা আদিয়ালা কারাগারের বাইরে একাধিকবার অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। সূত্র : ডন, জিও নিউজ

পশ্চিমাদের নীরবতা কিনছে আমিরাত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সুদানে 'জাতিগত যুদ্ধ'

সুদানের শাসক সার্বভৌমত্ব পরিষদের সদস্য এবং সেনাবাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াসির আল-আত্তা সাংবাদিকদের বলেন, আমিরাতের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ সুদানি জনগণের বিরুদ্ধে একটি জাতিগত যুদ্ধ শুরু করেছেন। আত্তা বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত আরএসএফ সুদানি জনগণের বিরুদ্ধে একটি বড় যুদ্ধ শুরু করেছে।' কিন্তু আরএসএফ যা করেছে তার বিষয়ে বিশ্ব নীরব। এই নীরবতা সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থের জোরে কেনা হয়েছে।'

ওমদুরমান সামরিক সদর দপ্তরের কাছে একটি রেস্তোরাঁয় সুদানি এবং বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে নৈশভোজে বক্তৃতাকালে আত্তা নীরবতার জন্য প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেনকে এককভাবে উল্লেখ করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্রিটেনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারে গত বছর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ২৪.৩ বিলিয়ন পাউন্ডে উন্নীত হয়। তিনি সাংবাদিকদের এমন একটি যুদ্ধের প্রতিবেদন করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেন বলেন, 'আমরা এক লাখ ৫০ হাজার সুদানি প্রাণ হারিয়েছি। বিশ্বের নজর না থাকায় আমাদের দেশে ভাড়াটে সৈন্য আনা হয়েছিল এবং আমিরাতকে তা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।' আত্তা বলেন, আমিরাত ইউক্রেন থেকেও যোদ্ধাদের ভাড়া করেছে। পাশাপাশি নাইজার, মালি, চাদ এবং দক্ষিণ সুদানের মতো আফ্রিকান দেশগুলো থেকেও যোদ্ধাদের ভাড়া করেছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি আরএসএফ সোমালিল্যান্ড থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ করেছে। অভিজ্ঞ সৈনিক আত্তা আবুধাবির শাসক মোহাম্মদ বিন জায়েদের বিরুদ্ধে সুদান থেকে আফ্রিকান উপজাতিদের তাড়ানোর পরিকল্পনার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছর আগে দুবাইয়ের একটি সূত্র তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে মোহাম্মদ বিন জায়েদ প্রায়শই আরএসএফ নেতা মোহাম্মদ হামদান দাগলোকে (হেমেতি নামে পরিচিত) 'সুদানের রাজপুত্র' বলে উল্লেখ করতেন।

আত্তা সাংবাদিকদের বলেন, আমিরাতের হস্তক্ষেপের একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে 'সংযুক্ত আরব আমিরাত কৃষির জন্য সোনা, অথবা জমি অথবা খনিজ সম্পদের জন্য জমি চায়। সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, ইয়েমেন এবং অন্যান্য দেশের সমস্যার পেছনে আমিরাতের হাত রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের আরব বসন্তের অভ্যুত্থানের পর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত বন্ধুত্বপূর্ণ স্বৈরাচারী সরকারগুলোকে শক্তিশালী করে এবং গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ইসলামের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই অঞ্চলে তার শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। সূত্র : মিডল ইস্ট আই

বায়ুদূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে শিশুরা

ইসমাইল হোসেন

শরীরের জন্য বায়ু অপরিহার্য, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং বেঁচে থাকার জন্য বায়ু প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। শরীরের বিভিন্ন কার্যকারিতা ও শক্তি সঞ্চালনে বায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দূষিত বায়ু যেন আমাদের চারদিক থেকে গ্রাস করে রেখেছে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, নিউমোনিয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্টের মতো শ্বাসযন্ত্রের রোগ হয়। এর পাশাপাশি হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যানসার, কিডনি ও চোখের সমস্যা, ডায়াবেটিস ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতিও হতে পারে।

বায়ুদূষণের ফলে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়ে শিশুরা। তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। পৃথিবীতে কেবল ২০২১ সালেই বায়ুদূষণের ফলে পাঁচ বছরের কমবয়সী ৭ লাখ শিশু মারা গেছে। তাহলে ভাবুন বায়ুদূষণের প্রভাব শিশুদের ওপর কেমন পড়ছে? বায়ুদূষণে ২০২৪ সালে দেশ হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। আর নগর হিসেবে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ নগর ছিল ঢাকা। শিল্পবিপ্লবের পর দূষণের নতুন যুগে প্রবেশ করেছে পৃথিবী। বিশেষ করে গাড়ি ও যন্ত্রপাতি তৈরির মাধ্যমে। বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ পুরনো যানবাহন, ফিটনেসবিহীন গাড়ি যা থেকে কার্বনমনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে যানবাহনের ধোঁয়া বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস। এ ছাড়া ট্যানারি, সিমেন্ট, টেক্সটাইল, রাসায়নিক কারখানা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে প্রায় লক্ষাধিক ইটভাটা রয়েছে যেগুলোর বেশির ভাগই অপরিকল্পিতভাবে তৈরি এবং প্রচলিত কয়লা বা কাঠে চালিত। এগুলো থেকে শুধু দূষিত ধোঁয়াই নির্গত হওয়ার মধ্যে থেমে নেই, পাশাপাশি মাটির গুণগত মান নষ্ট করা হচ্ছে। সাধারণত ইট তৈরিতে মাটির ওপরের অংশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাটির ওপরের অংশ ফসল উৎপাদনের জন্য পুষ্ট। এর ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। এই গুণগত ও উর্বর মাটি তৈরি হতে কয়েক বছর বা যুগের পর যুগ সময় প্রয়োজন হবে। তাই বিকল্প হিসেবে পোড়ানো ইট তৈরির পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধু কি বায়ুদূষণের মাঝে আমরা সীমাবদ্ধ আছি? উত্তর 'কখনই না'। পানিদূষণও একটি প্রধান কারণ। ময়লা, আবর্জনা, প্লাস্টিক ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত পানিতে ফেলছি। এ ছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, গরম পানি এগুলো অনায়াসে নদীতে ফেলা হচ্ছে। ক্রমাগত দূষণের ফলে নদীতে মাছের প্রজনন থেকে শুরু করে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, কিছু প্রজাতি বিলুপ্তও হচ্ছে। নদীদূষণের সবচেয়ে বড় উদাহরণ বুড়িগঙ্গা নদী। এবার আসি বায়ু নিয়ে, বায়ুমানের স্কোর ৩০০ পার হলেই সেটাকে ঝুঁকিপূর্ণ ধরা হয়। কিন্তু হরহামেশাই ঢাকার বায়ুর মানের স্কোর ৩০০ পার হচ্ছে। এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা বলছে, ১৯৮০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ১৩ কোটি মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে বায়ুদূষণের কারণে। বায়ুদূষণের ফলে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়ে শিশুরা। পৃথিবীতে কেবল ২০২১ সালেই বায়ুদূষণের ফলে পাঁচ বছরের কমবয়সী সাত লাখ শিশু মারা গেছে। বায়ুদূষণের শারীরিক ও মানসিক প্রভাব নিয়ে বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ হচ্ছে ঢাকায়। গবেষণায় বলা হয়, ঢাকায় সারাদিনে একজন মানুষ যে পরিমাণ দূষিত বায়ু গ্রহণ করে তা প্রায় দুটি সিগারেট খাওয়ার সমান ক্ষতিকর। আবার মানসিক প্রভাব তো রয়েছেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রা থেকে ১% দূষণ বাড়লে বিষণ্নতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা ২০ গুণ বেড়ে যেতে পারে।

বায়ুদূষণ রোধে পরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিবেশবান্ধব কারখানা ও গাড়ি তৈরি করা প্রয়োজন। পরিকল্পিতভাবে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও ভূমিকা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। পাশাপাশি আমাদেরও বায়ু ও পরিবেশ রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

ইসমাইল হোসেন : শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা কলেজ

অনিশ্চয়তার অর্থনীতি ও কৃষকের সমাজতত্ত্ব

ড. মিহির কুমার রায়

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্পে কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত কিংবা আরএমজির কথা উঠে এসেছে। কারণ এর মাধ্যমে ৪০-৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে প্রতি বছর। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক কাঠামোর কথা বললে দেশের প্রকৃত নায়ক হচ্ছেন কৃষক। ঠিকমতো দাম পাক আর না পাক তারাই দেশের প্রকৃত নায়ক। তাই সমন্বিত একটি কৃষিনীতি প্রণয়নে কাজ করা উচিত সরকারের।

অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক বর্তমানে নিম্নমুখী রয়েছে। যেমন বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি, নতুন ঋণপত্র (এলসি) খোলা এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি—এই সবই বিনিয়োগ স্থবিরতা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতির দীর্ঘায়িত প্রভাব, কারখানায় গ্যাসসংকট ও ডলারের তারল্য সংকট। এরই মধ্যে সাড়ে তিন শরও বেশি ছোট ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান খাতে তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বিমুখী ধাক্কার মুখে রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা। তারা আশঙ্কা করছেন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়লে ক্ষতিতে চলে যাবে অর্থনীতি। আবার সম্প্রতি আইএমএফ বলেছে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তবে দুর্বল কর রাজস্ব, আর্থিক খাতের দুর্বলতা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অর্থনীতি এখনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আইএমএফ আরও বলেছে, রাজস্ব ও আর্থিক খাতের সমস্যা মোকাবিলায় সাহসী নীতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যাতে টেকসই আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করা যায়। ঝুঁকিও এখনো প্রবল। বিশেষ করে যদি নীতি প্রণয়নে বিলম্ব হয় কিংবা অপর্যাপ্ত নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ঝুঁকি থাকবে। আইএমএফ মনে করে, মধ্য মেয়াদে শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করা, যুব বেকারত্ব হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনাকে বাড়াবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

এ ধরনের একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে ১ লা নভেম্বর জাতীয় কৃষি দিবস ও অগ্রহায়ণ-নবান্ন উৎসব পালিত হলো সারা দেশে। এখানে উল্লেখ্য হাজার বছরের এই কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে পহেলা দিনটিকে 'জাতীয় কৃষি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলার হেমন্তকাল মানেই ধান কাটা, নতুন চালের পিঠা-পায়েস আর কৃষকের মুখে হাসি। এই দিনটি কৃষির অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের এটি এক জাতীয় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি হলেও এর প্রাণপুরুষ সেই কৃষক আজও সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০% কৃষির সঙ্গে যুক্ত, অথচ কৃষির মোট জিডিপি অবদান মাত্র ১৩-১৪%। এর মানে দাঁড়ায়, কৃষকের পরিশ্রমের প্রকৃত আর্থিক মূল্য সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এই বৈষম্যই কৃষকজীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

৮ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর এক বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। দেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তাও আবার প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় এসেই নানামুখী সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে। ১১টি বিষয়ে সংস্কার সাধনের জন্য তারা কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু কৃষি বা কৃষক বিষয়ে কোনো কমিশন হয়নি। হয়নি হয়তো দুটো কারণে। এক. এটি সরকারের প্রায়োরিটি বিষয় নয় এবং দুই. কৃষি বা কৃষকের কোনো সমস্যা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কৃষিপ্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশে কৃষি কোনো সরকারের আমলেই প্রাধান্য পায়নি। কৃষি দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থান খাত হলেও এখানকার উৎপাদকদের জন্য কোনো নির্ধারিত মূল্য নীতি নেই, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পণ্যের অস্থির বাজারমূল্য, উৎপাদন ব্যয় না ওঠা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাকে বক্তারা এই সংকটের চরম বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এখানে উল্লেখ্য সম্প্রতি মেহেরপুরের পেঁয়াজ চাষি সাইফুল শেখ মহাজনী ও এনজিও ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এই কৃষক প্রতি মন পেয়াজ ৬০০ টাকা দরে বিক্রি করার পর যখন দেখেন, সেই পেঁয়াজ ব্যাপারি সপ্তাহ পর ২০০০ টাকা প্রতিমন দরে বিক্রি করছে, তখন যন্ত্রণাদগ্ধ হওয়ারই কথা। তারপর সাইফুল শেখের কন্যা রেফেজা বলেন, আমার বাবার মতো কৃষক যদি আত্মহত্যা করে তা হলে মানুষের অন্ন জোগান দেবে কে? মাত্র ছয় হাজার টাকা কৃষি ঋণ নিয়ে কৃষক জেলে গেছে, এরকম নজিরও আছে। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পেঁয়াজ চাষি মীর রুহুল আমিন ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন। কারণ সেই একই– পেঁয়াজ চাষে লোকসান। সঙ্গে ঋণের ভার। ১৮ আগস্ট একই জেলার মোহনপুরে পানচাষি আকবর হোসেন নিজের পানের বরজেই গলায় দড়ি দিয়েছেন। জানা যায়, আকবর হোসেন ১১টি এনজিও এবং স্থানীয় সুদের কারবারিদের কাছ থেকে ৬-৭ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিশোধ করতে পারছিলেন না। ঋণের কিস্তি ছিল প্রতি সপ্তাহে ৫ হাজার টাকা। কিন্তু পানের দাম না পাওয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে কষ্ট হচ্ছিল। এদিকে প্রতিদিন কিস্তির জন্য এনজিওর লোকেরা চাপ দিতেন। সে চাপ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে গলায় দড়ি দিলেন। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে একই জেলার পবা উপজেলায়। কৃষক মিনারুল ১৪ আগস্ট স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার আগে রেখে গেলেন একটি চিরকুট। তাতে লেখা– 'আমরা মরে গেলাম ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে। এত কষ্ট আর মেনে নিতে পারছি না।'

আমাদের এই সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কথাই কেবল খবরে আসে। তারা কোথায় নাশতা করেন, কোন হোটেলে ঘুমান। কিন্তু কৃষক মরে গেলেই কেবল খবর হয়। তাও সবসময় নয়।কৃষকের আত্মহত্যায় এই সমাজের কারও কিছু যদি যেত বা আসত, এত মৃত্যুর কোথাও না কোথাও প্রতিক্রিয়া হতো। নিদেনপক্ষে একটা মিছিল বা মানববন্ধন। তেমন কিছুই হলো না। খবরের কাগজে সংবাদেই সব শেষ। কারণ কৃষকরা সমাজে এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নন। গুরুত্বপূর্ণ হতে হলে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। এক. ব্যক্তিগত বিপুল অর্থসম্পদের মালিক এবং দুই. শ্রেণিগতভাবে সংগঠিত। আমাদের কৃষকদের এ দুটির কোনোটাই নেই। স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও এ দেশে শক্তিশালী কোনো কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তার মানে কি এই, বর্তমানে কৃষকদের কোনো সমস্যা নেই? তারা খুব সুখে আছেন? তাহলে কিছুদিন পরপর দেশের নানা জায়গায় কৃষকদের গলায় দড়ি পরতে হয় কেন? বলাবাহুল্য, ১৯৯৯ সালে প্রথম জাতীয় কৃষিনীতি প্রণীত হয়। ২০১৩ সালে একবার তা পরিমার্জন করা হয়। ২০১৮ সালে আরেকবার। প্রশ্ন হলো– আমাদের কৃষিনীতিতে কী আছে, তা কি কৃষক জানেন? এ ধরনের যে একটা আইন আছে, সেটাই বা কেউ জানেন? শুধু কৃষক নন; এই যারা কৃষকদের নিয়ে রাজনীতি করেন, তারা কি জানেন? আমি অন্তত গত ৪০ বছরে সংসদে বা অন্য কোথাও আমাদের কৃষিনীতি নিয়ে কোনো বিতর্ক শুনিনি। কোনোদিন কি তারা দেশের কৃষি বা কৃষক নিয়ে কোনো আয়োজন করেছেন? কারণ, আমাদের যে কৃষিনীতি, তা কেবলই উৎপাদনমুখী। উৎপাদন বৃদ্ধিই এর প্রধান লক্ষ্য। উৎপাদনের পেছনে যেসব মানুষ রয়েছেন, তাদের নিয়ে কোনো ভাবনা এই নীতিতে নেই।

পৃথিবীর উন্নত কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে কৃষকের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষা কর্মসূচি থাকে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তেমন কর্মসূচি নেই। সময়ের আবর্তে এক সময় যেখানে কৃষিকাজে নিয়োজিত হাউজহোল্ডের সংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশ, বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৬ শতাংশে, যা খাদ্যনিরাপত্তার জন্য হুমকি। চলতি বছরের বাজেটে কৃষি শস্য খাতের অংশ মাত্র ৩.৪%, যা টাকার অংকে দাঁড়ায় ২৭ হাজার ২২৪ কোটি। আবার কৃষিতে প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। কৃষি খাতের নিম্নগামী প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। এর একটি কারণ হলো মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা নেই। যার কারণেই কার্যকর কৃষি মূল্য কমিশন গঠনের প্রসঙ্গ এসেছে, যা সময়ের দাবি। সরকার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে একটি কমিশন গঠনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে। পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থাকলেও কৌশলগত পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য এ বছর ৩৭ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ধান-চালের দাম নির্ধারণে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা কৃষকদের জন্য শস্য বিমা চালু, আধুনিক সংরক্ষণব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমানোর আহ্বান জানান। তারা বলেন, কৃষি মূল্য কমিশন গঠন শুধু কৃষকদের আত্মহত্যা রোধ করবে না, বরং তা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে। তার মানে প্রাইস কমিশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এখন প্রশ্ন হলো এই কমিশনের কাঠামো কি হবে? সেটা হতে হবে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা। সংস্থাটি পণ্যের মূল্য উঠানামা, কৃষি বাজার নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ, বাজার ম্যানিপুলেশন ও কৃষকের পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর অংশ হিসাবে কমিশন বাজারের গতিবিধি বিশ্লেষন, উৎপাদন খরচ বিবেচনা এবং বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ (এমএসপি) নির্ণয় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়াও কৃষি সাবসিডি, মূল্য সংযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিও কমিশন দেখবে। এতে কৃষকরা একটি স্থিতিশীল বাজার মূল্য পাবে যা তার জীবনের নিরাপত্তার জন্য সহায়ক। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্পে কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত কিংবা আরএমজির কথা উঠে এসেছে। কারণ এর মাধ্যমে ৪০-৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে প্রতি বছর। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক কাঠামোর কথা বললে দেশের প্রকৃত নায়ক হচ্ছেন কৃষক। ঠিকমতো দাম পাক আর না পাক তারাই দেশের প্রকৃত নায়ক। তাই সমন্বিত একটি কৃষিনীতি প্রণয়নে কাজ করা উচিত সরকারের।

লেখক: কৃষি গবেষক ও অর্থনীতিবিদ, সাবেক ভিসি, সিটি ইউনিভার্সিটি।

জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে একটি পর্যালোচনা

বিধান চন্দ্র দাস

অবশেষে কপ-৩০-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হলেন। তবে কপ-৩০-এর জন্য নির্ধারিত তারিখের (১০-২১ নভেম্বর ২০২৫) মধ্যে এটি করা সম্ভব হয়নি। অতীতেও কয়েকবার কপের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেই চুক্তি হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়।

এবার যে কারণগুলোর জন্য চুক্তি সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে সময়ের বাইরে গড়াল, সেগুলো হচ্ছে- এক. খসড়া প্রস্তাবে জীবাশ্ম জ্বালানি পরিবর্তনের রোডম্যাপ না থাকা; দুই. বিনিয়োগ ও অভিযোজন তহবিল নিয়ে মতবৈষম্য; তিন. মূল সম্মেলনস্থলে অগ্নিকাণ্ড এবং চার. লবিং ও শিল্প প্রভাব ইত্যাদি। তবে অনেক রশি টানাটানির পরও 'বেলেম রাজনৈতিক প্যাকেজ' নামে ২৯টি সিদ্ধান্তযুক্ত একটি প্যাকেজ পাস করা সম্ভব হয়েছে। প্যাকেজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে এক. উষ্ণমণ্ডলীয় বন ও আদিবাসী অধিকারভিত্তিক বৈশ্বিক জলবায়ু সংহতি; দুই. প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ; তিন. অভিযোজন অর্থায়ন বৃদ্ধির অঙ্গীকার; ৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কাঠামো শক্তিশালীকরণ; চার. জলবায়ুনীতিতে লিঙ্গসমতা পদক্ষেপ এবং পাঁচ. জলবায়ুবান্ধব ন্যায্য বাণিজ্য ও সবুজ অর্থনীতির দিকে রূপান্তরের নীতি উল্লেখযোগ্য।

প্যাকেজে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আরো বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে আশা-জাগানিয়া। এর ফলে চরম আবহাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পক্ষে প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হবে। এই সহায়তার মূল লক্ষ্য হলো, অভিযোজন অর্থায়নকে তিন গুণ (১২০ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে) করা। তবে এই লক্ষ্যের সময়সীমা ২০৩৫ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে সবুজ অর্থনীতির দিকে ন্যায্য পরিবর্তনের জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণে সব দেশ একমত হয়েছে।

এই চুক্তির হতাশার দিক হলো, চূড়ান্ত চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। মূল খসড়া চুক্তিতে রূপান্তরের কথা বলা হলেও শক্তিশালী তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো এবং অন্যান্য বড় নিঃসরণকারী দেশের তীব্র আপত্তির কারণে চূড়ান্ত পাঠ্যটিতে সেই ভাষাটিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মানুষের ভাগ্য ও সময়সীমা নিয়ে নির্দিষ্ট রোডম্যাপ চুক্তিতে অনুপস্থিত। এটি মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পকে ঘিরে থাকা বিশাল প্রভাব এবং লবিংয়ের ফল। বন উজাড় সংক্রান্ত রোডম্যাপও বাদ পড়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের সময়সীমা নিয়েও অনেকে হতাশা প্রকাশ করেছেন। গার্ডিয়ান বলেছে, 'দুর্বল ও আপসকামী চুক্তি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুব সামান্যই কাজ করবে।' রয়টার্স লিখেছে, 'জীবাশ্ম জ্বালানিকে এড়িয়ে কপ-৩০-এ অস্বস্তিকর জলবায়ু চুক্তি অনুমোদিত।' বিবিসি বলেছে, 'কপ-৩০ চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানির উল্লেখ নেই।'

এবারের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশন (কপ-৩০) ব্রাজিলের উত্তরাঞ্চলের রাজ্য 'পারা'-র রাজধানী 'বেলেম'-এ গত ১০ থেকে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের এই সম্মেলনটি অনেক কারণে ঘটনাবহুল সম্মেলন বলা যায়। বিশেষ করে এবারের এই সম্মেলনে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ইত্যাদির মাত্রা; প্যাভিলিয়নে আগুন লাগা, নতুন প্রতিপাদ্য ও উদ্যোগ এবং এ ধরনের বৈশ্বিক সম্মেলনের জন্য বেলেমের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসহ বেশ কিছু বিষয়ের বিবেচনায় কপ-৩০কে ব্যতিক্রমধর্মী বলে অভিহিত করা যায়।

> কপ-৩০ সম্মেলন বেলেমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাজন ও প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। সম্মেলনে উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে (ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো) আদিবাসী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন হেক্টর জমির অধিকার স্বীকৃতির জন্য বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ব্রাজিল সরকারের তত্ত্বাবধানে সে দেশের বন সংরক্ষণ ও বনভিত্তিক অর্থনীতির জন্য ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আগের লক্ষ্যের দ্বিগুণেরও বেশি। এ ছাড়া ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরএভার ফ্যাসিলিটি (টিএফএফএফ) নামে নতুন একটি আর্থিক উদ্যোগ (ফান্ড) আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে

এবার মূল সম্মেলনের বাইরে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ (আদিবাসী, স্থানীয় সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমিক, সামাজিক ও পরিবেশ সংগঠন) একসঙ্গে হয়ে কথোপকথন, কর্মশালা ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে 'পিপলস সামিট' অর্থাৎ সিভিল সোসাইটি এবং সামাজিক জনগোষ্ঠীর সম্মেলন (১২-১৫ নভেম্বর ২০২৫) সম্পন্ন করেছে। এর জন্য নগর ও নদীর মধ্য দিয়ে গণমিছিল, অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম, নৌ শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপকভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের মূল দাবি ছিল 'জলবায়ু ন্যায্যতা, ভূমি? অধিকার, বন ও বন্যজীবন সংরক্ষণ, ন্যায্য রূপান্তর (কয়লা-গ্যাস সেক্টরে কাজ করা মানুষকে পরিবর্তিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা), জলবায়ু পরিবর্তনের মিথ্যা সমাধান (কার্বন বাজার ও প্রযুক্তিগত সমাধান) প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি।

কপের ইতিহাসে এই প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন নির্গমনকারী দেশ) কোনো সরকারি প্রতিনিধিদল কপ সম্মেলনে পাঠায়নি। এটিও একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা, যদিও সে দেশ থেকে বেসরকারিভাবে কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সম্মেলনের ৯ মাস আগে (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) কপ-৩০-এর প্রেসিডেন্ট মি. লাগো জনসমক্ষে দেওয়া এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'বেলেমে অনুষ্ঠেয় কপ-৩০ গতানুগতিক হতে পারে না, এটিকে অবশ্যই একটি ভিন্ন কপ হতে হবে।' উপরোক্ত ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাগুলোর সূত্র ধরে কেউ হয়তো কপ-৩০ ভিন্ন হয়েছে বলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতেই পারেন। কিন্তু তার পরও কপ-৩০-এর মাধ্যমে কিছু ইতিবাচক বিষয় অবশ্যই অর্জিত হয়েছে, তা বলা যায়।

প্রথমত, কপ-৩০ সম্মেলন বেলেমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাজন ও প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। সম্মেলনে উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে (ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো) আদিবাসী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন হেক্টর জমির অধিকার স্বীকৃতির জন্য বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ব্রাজিল সরকারের তত্ত্বাবধানে সে দেশের বন সংরক্ষণ ও বনভিত্তিক অর্থনীতির জন্য ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আগের লক্ষ্যের দ্বিগুণেরও বেশি। এ ছাড়া ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরএভার ফ্যাসিলিটি (টিএফএফএফ) নামে নতুন একটি আর্থিক উদ্যোগ (ফান্ড) আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। এই অর্থ মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন থাকা দেশগুলোকে বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধে উৎসাহিত করতে ব্যয় করা হবে। এটি একটি 'পে ফর পারফরম্যান্স' মডেল এবং এটি স্যাটেলাইট ডেটার মাধ্যমে বন সংরক্ষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবে।

দ্বিতীয়ত, কপ-৩০-এ প্রতিশ্রুতির তুলনায় বাস্তবায়ন এবং কার্যকর অর্থায়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ক্লিন এনার্জি ও গ্রিড (স্মার্ট গ্রিড, নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকাঠামো এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিনিয়োগে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থাগুলোর যৌথ অঙ্গীকারে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ গ্রিড ও দূষণহীন শক্তিতে মোট এক ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি অবশ্যই বাস্তবায়নমুখী রূপান্তরের সূচক। পাশাপাশি একটি বৈশ্বিক উদ্যোগের মাধ্যমে সুস্থায়ী জ্বালানি চার গুণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও (বেলেম কমিটমেন্ট ফর সাসটেইনেবল ফিউয়েলস) গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জলবায়ু সহনশীল করতে 'ক্লাইমেট প্রুফিং এসএমইএস ক্যাম্পেইন' চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় যে কপ-৩০ জলবায়ুনীতিকে কেবল আলোচনা নয়, বরং একে কার্যকরভাবে প্রয়োগ, অর্থায়ন এবং রূপান্তরমুখী শক্তি খাত উন্নয়নের বাস্তব ধারায় নিয়ে এসেছে।

তৃতীয়ত, কপ-৩০-এ মহাসাগর ও খাদ্যব্যবস্থাকে জলবায়ু আলোচনার মূলধারায় আনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। ব্রাজিল ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে নতুন 'ওশান ট্রান্সফোর্স' ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর লক্ষ্য হলো সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, সমুদ্রভিত্তিক সমাধান ও নীল অর্থনীতিকে জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে আরো সুসংহতভাবে যুক্ত করা। একই সঙ্গে কৃষি খাতের নির্গমন হ্রাস ও পুষ্টি-দক্ষতা বাড়াতে 'বেলেম ডিক্লারেশন অন ফার্টিলাইজার্স' গৃহীত হয়েছে। এর ফলে বৈশ্বিক সার উৎপাদন ও ব্যবহারে নির্গমন কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে কপ-৩০ শুধু শক্তি খাত নয়, বরং সমুদ্র, কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশলগত অংশ হিসেবে বিবেচনায় এনেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ চুক্তি এবং সংঘটিত ঘটনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে কপ-৩০ বিশ্বকে আশা আর হতাশার মিশ্র এক চিত্র উপহার দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষিতে ‘রোজেলা’ সবজির সম্ভাবনা

ড. মো. আল-মামুন

বাংলাদেশের কৃষি আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ফসল উৎপাদনে অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে চাষযোগ্য জমির ওপর বেড়েছে চাপ। এই বাস্তবতায় কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন বিকল্প ফসল, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং এমন কিছু উদ্ভাবনী উপাদান, যা ভবিষ্যতের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। দীর্ঘদিন অবহেলিত সবজি মেস্তা বা রোজেলা তাই সামনে এসেছে নতুন সম্ভাবনার ফসল হিসেবে। লাল ক্যালিক্স, ভিটামিনসমৃদ্ধ পাতা এবং প্রক্রিয়াজাত শিল্পে ব্যবহারযোগ্যতার কারণে এটি এখন কৃষক থেকে উদ্যোক্তা-সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

বিশ্বের বহু দেশেই রোজেলা বহুল ব্যবহৃত। আফ্রিকা, সুদান ও মিসর থেকে ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত নানা দেশে রোজেলা থেকে তৈরি চা, জেলি, ক্যান্ডি বা পাউডার ব্যাপক জনপ্রিয়।

বাংলাদেশেও ফসলটির পরিচিতি বিস্তৃত, তবেঅঞ্চলভেদে এর নাম এত ভিন্ন যে চাষাবাদে কখনো বিভ্রান্তি তৈরি হয়। রাজশাহীতে চুকাই, খুলনা-সাতক্ষীরায় অম্লমধু, সিলেটে হইলফা, কুমিল্লায় মেডশড়এ যেন স্থানীয়তার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এক রঙিন ভুবন। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও রোজেলার আলাদা পরিচিতি রয়েছে। এই বৈচিত্র্য শুধু নামেই নয়; বরং ফসলটির সামাজিক বিস্তার ও দীর্ঘদিনের গ্রামীণ ইতিহাসের কথাও তুলে ধরে।

বাংলাদেশের মাঠে রোজেলা চাষ এখনো সীমিত পরিসরে। অসংখ্য কৃষক জানতেই পারেন না, তাদের জমিতে যে লাল ক্যালিক্স ফুটে থাকে, তা কেবল একটি টক স্বাদের অপরিচিত ফল নয়; আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন উচ্চমূল্যের একটি পণ্য। যে কৃষক গতকাল পর্যন্ত একে গুরুত্বহীন ভাবতেন, যথাযথ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বাজারসংযোগ পেলে তিনিই হয়ে উঠতে পারেন নতুন উদ্যোক্তা। রোজেলা উপেক্ষিত সম্ভাবনার জাগরণ কৃষির বহুমুখীকরণের অনিবার্য অঙ্গ এবং নীতি-নির্ধারকদের দ্রুত মনোযোগ দাবি করা বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

রোজেলার সবচেয়ে বড় শক্তি তার বহুমুখিতা। একটি গাছ থেকেই পাওয়া যায় পুষ্টিসমৃদ্ধ পাতা, ক্যালিক্স, বীজ ও প্রাকৃতিক রঙ। পাতাকে সবজি হিসেবে খাওয়া যায়, আর ক্যালিক্স দিয়ে তৈরি হয় বিশ্বখ্যাত রোজেলা চা, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিনসমৃদ্ধ হওয়ায় উচ্চ রক্তচাপ ও খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে ভূমিকা রাখে। ডায়েট-সচেতন মানুষের কাছে এটি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়েছে। শিল্পখাতেও রোজেলার ব্যবহার বিস্তৃত; বিশেষ করে পানীয়, বেকারি, শিশুখাদ্য, প্রসাধনী এবং বস্ত্রশিল্পে এর প্রাকৃতিক রঙের গুরুত্ব বাড়ছে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যসচেতনতার যুগে হারবাল কসমেটিকসে রোজেলাভিত্তিক পণ্যের চাহিদা বাড়ায় ফসলটির শিল্পমূল্য আরও স্পষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক এখনও একদুই ধরনের প্রধান ফসলে নির্ভরশীল। ফলে বাজারদর কমে গেলেই তাদের জীবিকা টলে যায়। এই প্রথাগত কাঠামো ভেঙে নতুন আয়ের দরজা খুলে দিতে পারে রোজেলা - বহুমুখী, কম খরচে চাষযোগ্য এক সম্ভাবনাময় ফসল। অল্প জমিতেই রোজেলা চাষ লাভজনক। কয়েকটি গাছ থেকেই যে পরিমাণ ক্যালিক্স পাওয়া যায়, তা প্রক্রিয়াজাত করে চা, পাউডার, জেলি বা আচার বানালে কৃষকের আয় কয়েকগুণ বাড়তে পারে। শুধু ক্যালিক্স নয়, তাজা রোজেলা পাতা স্থানীয় বাজারে প্রতিদিন

বিক্রি করে বাড়তি আয় করাও সম্ভব। আর এসব প্রক্রিয়াজাতকরণে গ্রামের নারীদের জন্য তৈরি হতে পারে ছোট উদ্যোগ-শুকনো পাতা, চা-ব্যাগ, আচার বা জেলি তৈরির মতো সহজ কিন্তু লাভজনক কার্যক্রম।

দেশে রোজেলা চাষে গবেষণার অগ্রগতি থাকলেও তা মাঠে পৌঁছতে পারেনি যথাযথভাবে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বিজেআরআই মেস্তা-২ ও বিজেআরআই মেস্তা-৪ জাত দুটি কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। প্রথমটি উচ্চ ফলনশীল ও স্বাদে সমৃদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি খরা সহনশীল, নেমাটোড প্রতিরোধী এবং অনুর্বর জমিতেও ভালো বেড়ে ওঠে। কিন্তু কৃষকের জানাশোনা কম, বাজারসংযোগ দুর্বল এবং সরকারি অগ্রাধিকারের অভাবের কারণে উন্নত জাতের সুবিধা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে না। ফলে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে পিছিয়ে আছে, যেখানে সুদান বা থাইল্যান্ড রোজেলা রপ্তানিতে কোটি ডলারের বাজার দখল করে ফেলেছে।

রোজেলা চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য নির্ধারিত হয় ক্যালিক্স শুকানোর মানের ওপর। বাংলাদেশে সাধারণ রোদে শুকিয়ে নিম্নমানের পণ্য তৈরি করা সম্ভব হলেও রপ্তানিযোগ্য মানে পৌঁছাতে প্রয়োজন হাইজিন নিয়ন্ত্রিত ড্রায়ার, মানসম্মত প্যাকেজিং ও স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তি। থাইল্যান্ড বা সুদানে এই ধরনের ছোট ছোট ইউনিট এখন ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে। অথচ বাংলাদেশে এর প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি কৃষকদের উৎপাদনকে স্থানীয় বাজারে আটকে রেখেছে। একটি সম্ভাবনাময় ফসল শুধুই প্রযুক্তিগত ঘাটতি ও নীতিগত অবহেলার কারণে এখনো অনুন্নত অবস্থায় পড়ে আছে-এটাই রোজেলার বাস্তবতা।

রোজেলা নিয়ে বিশ্ববাজারের সাফল্য আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। আফ্রিকান নারীর ছোট বাগানের রোজেলা আজ আন্তর্জাতিক খাদ্য ও পানীয় শিল্পের কাঁচামাল। সুদানের ‘কারকাদে’ চা তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। থাইল্যান্ডে রোজেলাকে ‘সুপারফুড’ হিসেবে পরিচিত করে একটি শক্তিশালী ভ্যালু চেইন গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনও রোজেলার জন্য নেই কোনো জাতীয় নীতি, নেই কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা ব্যাপক সরকারি প্রকল্প। কৃষি সম্প্রসারণেও ফসলটি তেমনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে চাষাবাদ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে, আর কৃষকেরাই নিজের উদ্যোগে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। রোজেলাকে উদীয়মান ফসল হিসেবে কৃষিনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় জায়গা দিতে হবে।

বিজেআরআই, বিসিএসআইআর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে নতুন জাত, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, ক্যালিক্সের রঙ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাত্রা নিয়ে গবেষণায় গতি আনা যেতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লট ও প্রশিক্ষণ চালু করলে কৃষকেরা সহজে শিখতে পারবেন। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে ছোট প্রক্রিয়াজাত ইউনিট-ড্রায়ার, প্যাকেজিং বা চা-জেলি তৈরির সরঞ্জাম স্থাপন করা গেলে স্থানীয় যুবও নারী উদ্যোক্তারা দ্রুত যুক্ত হতে পারবেন। আন্তর্জাতিক মান ও ব্র্যান্ডিং নিশ্চিত করা গেলে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকার বাজারেও “বাংলা রোজেলা” দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

সমীক্ষা বলছে, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, চিনিমুক্ত পানীয়ের জনপ্রিয়তা এবং প্রাকৃতিক পণ্যের প্রতি বৈশ্বিক ঝোঁক রোজেলার বাজারকে দ্রুত বিস্তৃত করছে। এ বাজারে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই সুবিধাজনক অবস্থানেড়আমাদের জলবায়ু ও মাটি রোজেলা চাষের জন্য আদর্শ। স্বল্প পুঁজিতে ঘরের পাশেই রোজেলা চাষ, ক্যালিক্স শুকানো বা পণ্য প্রস্তুতের সুযোগ নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে স্পষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। প্রয়োজন শুধু যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং বাজারসংযোগ। এগুলো নিশ্চিত করতে পারলে রোজেলা বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন, বাজারের অস্থিরতা, উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি - সবমিলিয়ে কৃষক আজ ঝুঁকির ভেতরে। এমন পরিস্থিতিতে রোজেলার মতো বহুমুখী, উচ্চমূল্যের, জলবায়ু সহনশীল এবং প্রক্রিয়াজাতভিত্তিক ফসলই কৃষিকে নতুন পথ দেখাতে পারে। রোজেলার সম্ভাবনা কৃষকের আয়ের গণ্ডি পেরিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সুস্বাস্থ্য সচেতনতা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কৃষির বহুমুখীকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। রোজেলার গল্প তাই উপেক্ষিত সম্ভাবনার গল্প - যা সঠিক পরিকল্পনা, গবেষণা ও বাজার ব্যবস্থার সহায়তা পেলে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে নতুন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে।

লেখক : কৃষিবিদ ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

অভিমত

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও সুন্দরবন

জলবায়ু পরিবর্তন নামে এক অদৃশ্য শক্তি সুন্দরবনের ভেতর ঢুকে পড়েছে, বদলে দিচ্ছে বনের রূপ, জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন অনিশ্চয়তার। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত এই বনের রাজা।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে সুন্দরবনের দক্ষিণভাগ নিয়মিত পানির নিচে চলে যায়। লবণাক্ততার ওপরে লবণাক্ততা জমা হয়ে গাছগুলোর শিকড় দুর্বল করে তোলে। কোনোদিন যেসব জায়গায় গেওয়া-গরান-সুন্দরী গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত, সেখানে এখন দেখা যায় মৃত গাছের সারি। তাদের বিবর্ণ শাখাগুলো যেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রকৃতির এক নীরব প্রতিবাদ। আর এই শুকিয়ে যাওয়া বনের ভেতর দিয়ে বাঘ হাঁটে কিন্তু সেই হাঁটায় নেই আগেকার সেই নিশ্চিন্ততার ছায়া।

মিঠা পানির গুরুত্ব একটি বনের জন্য কতটা, তা হয়তো শহরের মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু সুন্দরবনের প্রতিটি বাঘ জানে মিঠা পানির খালই তার প্রাণ। ঘূর্ণিঝড়ে যখন লোনা পানি পুরো বন ভাসিয়ে দেয়, তখন সেই খাল-বিল কয়েক সপ্তাহ, কখনও কয়েক মাস পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে থাকে। ফলাফল- পিপাসায় বাঘকে আরও দূরে যেতে হয়, শক্তি খরচ হয় বেশি, আর শাবকদের বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। একটি বাঘিনী যখন শাবক নিয়ে নিরাপদ জায়গা খোঁজে, তখন সেই লবণাক্ত বাতাস তার প্রতিটি পদক্ষেপকে আরও কঠিন করে তোলে।

এখন প্রশ্ন-আমরা কী করতে পারি? প্রথমত, সুন্দরবনের লবণাক্ততা সহনশীল গাছপালা দিয়ে বিস্তৃত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম চালাতে হবে। দ্বিতীয়ত, মিঠাপানির রিজার্ভ তৈরি ও খাল-বিল পুনর্জীবিত করতে হবে। তৃতীয়ত, বাঘের আন্দোলনপথ ও বাসস্থান রক্ষায় প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়াতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- সুন্দরবনের ওপর মানুষের চাপ কমানো। কারণ বনের প্রতিটি আঘাত শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে বাঘের ওপরই। যদি জলবায়ু পরিবর্তনের গতি এভাবেই চলতে থাকে, তবে আগামী দশকগুলোতে সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পানির নিচে হারিয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে বাঘের পদচিহ্ন।

তবে হতাশ হওয়ার সময় এখনও আসেনি। মানুষ যদি এখনই দায়িত্ব নেয়, যদি সুন্দরবনকে পৃথিবীর একটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ সুরক্ষা দেয়, তবে বাঘের ভবিষ্যত এখনও রক্ষা পেতে পারে।

লেখক : শায়লা নাজনীন শিক্ষার্থী
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ হেমন্তে শীতের আমেজ

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। ছয়টি ঋতু হলেও মূলত আমাদের দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকাল প্রধান। ঋতুচক্রের আবর্তনে এখন চলছে শীতকাল। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-প্রীতিতে অন্যান্য ঋতুর তুলনায় এই ঋতু অনন্য।

শীতে বা রবি মৌসুমে কাঁচাবাজার নানা শাক-সবজি, ফল-ফুলে ভরে ওঠে। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুরের রস, পিঠাপুলির উৎসবে বাড়ি বাড়ি নানা আয়োজনের ধুম পড়ে। তবে শীত সবার জন্য আনন্দের নয়। বিখ্যাত কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে- 'কুহেলী উত্তরীয় তলে মাঘের সন্ন্যাসী।' শহরের তুলনায় গ্রামে শীত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। গ্রামের বসবাসরত বেশিরভাগ মানুষ নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত, তাদের অধিকাংশই কৃষি নির্ভর। তাদের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন।

গরমে যেমন অসহ্য গরম তেমনি শীতে তীব্র শীত। শীতে গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষের কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। দিনের পর দিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। ভাঙা বাড়ি, ভাঙা ঘর তার উপরে শীতের ঝড়- যেন সাইবেরিয়ার হিমবাহ। অনেক পরিবারের মানুষের শীতের বস্ত্রাদি থাকলেও সবার ঘরে শীত মানিয়ে নেওয়ার মতো গরম কাপড় তথা শীতবস্ত্র নেই। সরকার প্রতিবছর শীত বস্ত্র বিতরণ করে থাকলেও শীত নিবারনের এই বস্ত্র কতটুকু সকল ভুক্তভোগীর নিকট পৌঁছায় তা বলা বাহুল্য। তাদের জীবনের প্রতিটি দিন রাত কাটে শীতের সাথে যুদ্ধ করতে করতে।

কথায় আছে- 'মাঘ মাসের শীতে মোষের শিং নড়ে।' অর্থাৎ, পৌষ-মাঘ মাসের সময় এমন হাড়কাঁপানো শীত পড়ে যার দাপটে মোষের শিং ও ঠকঠক করে নড়ে। শীতের সময় শিশু ও প্রবীনদের অবস্থা খুব শোচনীয়। দরিদ্র এতিম অসহায় মানুষের অবস্থান কতটা ভয়াবহ তা যারা স্বচক্ষে দেখেছেন বা উপভোগ করেছেন তারাই বলতে পারবেন। এসময় মানুষের ঠান্ডা -জ্বর নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধি দেখা দেয়।

শীতের সময়ে আমরা যদি সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করি, বয়স্ক ও শিশুদের খেয়াল রাখতে পারি, তাদের যত্ন নিই, সাধ্যমতো অসহায় ও দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই। তাদের প্রতি একটু যদি মমতার হাত বাড়াই তাহলেই তাদের জীবনও হবে বেশ সুন্দর। আমাদের শীত ঋতু হবে উপভোগ্য এবং সবার জন্য শান্তিময়। আমাদের দেশ হবে সুন্দর।

লেখক : সজিব হোসেন শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ

Dhaka must upgrade API policy as LDC graduation imminent

MS SIDDIQUI

The global pharmaceutical market was valued at approximately USD 1.64 trillion in 2024 and is projected to reach USD 2.1-2.3 trillion by 2030, covering prescription drugs, generics, biologics, vaccines, and over the counter (OTC) products. Global pharmaceutical exports currently stand around USD 825-900billion. Bangladesh's export share is about 0.02-0.03%, compared with 3-4% for China and 2-3% for India.

Bangladesh now maintains strong domestic pharmaceutical performance meeting 98% of national demand and exporting medicines to more than 150 countries. Export earnings, however, remain modest: USD 175 million in FY2022-23 (?7% YoY), USD 205 million in FY2023-24 (+17.1% YoY) and USD 213 million in FY2024-25 (+4% YoY). The top five export destinations of Bangladesh are the USA (24.8%), Germany (16.1%), the UK (9.7%), France (8.3%), and the Netherlands (8.1%). Exports to China and India remain insignificant.

Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)is the main ingredients of Pharmaceuticals. It account for 30-55% of drug costs, and Bangladesh imports about USD 1.3 billion annually. A fully operational park could cut raw-material costs by up to 70% and significantly reduce imports, while continued delays risk higher production costs and export declines of around 6.9%.The long-delayed Gazaria API Park approved in 2008 remains the main bottleneck. Authority not yet arranged gas supply at the park. One API industry built a factory and now day paying Tk20 lac bank interest, but the factory is not operational due to lac of gas. A fully operational park could cut raw-material costs by up to 70% and significantly reduce imports, while continued delays risk higher production costs and export declines of around 6.9%.

China's rise as the world's leading API producer is the result of coordinated state policy, large-scale industrial planning, and long-term investment. Key drivers include: (i)Strong state support through industrial policy, export incentives, and long-term sectoral planning, (ii)Large, dedicated API and chemical industrial zones with integrated supply chains and shared infrastructure, (iii) High and sustained R&D investment in process innovation, biotechnology, and cost-efficient manufacturing, (iv)Competitive utility and logistics costs, supported by scale advantages and efficient clustering, (v)Industrial-scale capacity in fermentation, chemical synthesis, and intermediates, enabling global export dominance, (vi)Strict cost-control ecosystems and backward integration into raw materials and intermediates. (vii)Proactive environmental and quality compliance reforms to meet global regulatory standards after 2015.

India often called the "Pharmacy of the World" strengthened its API sector through a mix of industrial policy, incentives, and regulatory reforms. Key initiatives include: (i) Production-Linked Incentive (PLI) schemes to boost domestic API manufacturing and reduce dependence on imports, (ii)API Parks & Bulk Drug Parks with shared utilities, effluent treatment, and common facilities to lower production costs, (iii) Subsidized capital support and viability gap funding for fermentation-based and complex APIs, (iv)Fast-track regulatory approvals and predictable quality-compliance frameworks through CDSCO, (v)Public-private partnerships and state-level incentives in major pharma clusters (Hyderabad, Gujarat, Maharashtra), (vi)R&D strengthening via dedicated biotech funds, innovation councils, and industry-academia collaboration, (vii)Export facilitation through SEZs, logistics support, and global regulatory harmonization.

Bangladesh's Policy Context and Global Position is reflected in the National API and Laboratory Reagents Production and Export Policy, 2018 (valid until 31 December 2032). It remains the central framework for API sector development. A research organization, SANEM's 2022 Assessment: Key Findings on the API Policy: (1)The API Policy is conceptually strong, (2)Implementation progress has been significantly delayed, (3)The Gazaria API Park (approved 2008) remains incomplete, (4)Bangladesh still imports 90% of APIs, (5)A severe human capital gap persists, (6)Only ~40 API molecules (11%) are produced locally versus a target of 360, (7)Global demand and export opportunities are expanding, (8)Bangladesh's TRIPS flexibility effectively ends in November 2026(Due to LDC graduation) , despite the general waiver lasting until July 2033.

The Path Forward for Bangladesh are: (1)Secure a Pharmaceutical TRIPS Extension. With TRIPS exemptions ending in November 2026, the Ministry of Commerce must lead early diplomatic engagement ahead of MC14 (26-29 March 2026, Cameroon). Bangladesh should pursue a sector-specific pharmaceutical extension, follow the Maldives precedent and frame the request around medicine security and public health, (2)Establish a High-Powered National API Implementation and Development Council. The Council should include Government, industry, academia, and other stakeholders. It must centrally monitor progress, coordinate DGDA-NBR-MoC actions, and remove regulatory bottlenecks. Its immediate mandate should be to assess implementation gaps in the 2018 Policy and design a practical, time-bound action plan. Monthly meetings and legal authority to overcome inter-agency obstacles are essential. The Council should also adopt, at minimum, the good practices of China and India, enabling full implementation of the API Policy within the next five years.

With Bangladesh set to graduate in November 2026, its TRIPS exemptions will expire, making early diplomatic engagement crucial. The Ministry of Commerce must lead preparations ahead of MC14 (26-29 March 2026, Cameroon) to secure a sector-specific pharmaceutical TRIPS extension, drawing on the Maldives precedent and framing the request around national medicine security and public-health needs.

Bangladesh should establish a high-powered National API Implementation and Development Council comprising representatives from the Government, pharmaceutical industry, academia, and other key stakeholders. This Council would centrally monitor progress, coordinate DGDA-NBR-MoC actions, and remove regulatory bottlenecks. Its immediate mandate should be to identify the implementation gaps in the 2018 API Policy and prepare a new time-bound action plan. The Council should meet monthly and be legally empowered to resolve inter-agency obstacles. It should also draw on the best at minimum, the good practices of China and India so that Bangladesh can achieve full and effective implementation of the National API and Laboratory Reagents Production and Export Policy, 2018 within the next five years.

The choice for Bangladesh is clear. It may go ahead with decisive reforms, Bangladesh can achieve pharmaceutical self-reliance, expand exports, and secure a stronger global position. Without timely action, the sector faces rising costs, increased vulnerability, and a potential erosion of competitiveness. The window of opportunity is narrow, but still open (November,2026) urgent, coordinated, and time-bound action is imperative for securing Bangladesh's pharmaceutical future.

The writer is CEO, Bangla Chemical

Chemical use in agriculture endangers birds, butterflies

TAMANNA ISLAM

The nature around us is no longer the same. The colorful butterflies that once flew from garden to garden, the birds that woke us up in the morning, are now becoming increasingly rare. The Doel, Shalik, or Babui birds are no longer seen in the village fields as they used to be. The number of butterflies in flower gardens has also decreased alarmingly. Although there are many reasons behind this sad situation, the biggest culprit is the excessive use of chemicals in agriculture.

In modern agriculture, farmers are using various chemical fertilizers, pesticides, and herbicides to increase crop production. On the one hand, the demand for food is increasing due to population growth, on the other hand, the pressure to grow more crops on limited land is increasing. In this situation, farmers have become dependent on chemicals to get quick results. But these chemicals are not only killing harmful insects, but are also becoming a serious threat to beneficial insects, birds, and the environment as a whole.

Pollinators like butterflies and bees are the ones who are most affected by the use of pesticides. These small creatures are a very important part of our ecosystem. Butterflies and bees fly from flower to flower and help in pollination. It is through this pollination that fruits and crops are produced. But when toxic chemicals are sprayed on agricultural land, the poison enters the bodies of butterflies and bees. Sometimes they die immediately, and sometimes their reproductive capacity is destroyed due to poisoning. Gradually, their numbers start decreasing and entire species are threatened with extinction.

Various species of butterflies that were once very common are no longer seen. Those beautiful butterflies with colorful wings that used to fascinate children are now a matter of luck. The main reason for this is the lack of food and habitat for them. Excessive use of chemical fertilizers destroys soil fertility and prevents the growth of wild flowers and plants. The trees on which butterflies lay their eggs or the flowers from which they feed are no longer able to survive. As a result, the life cycle of butterflies is being disrupted.

The condition of birds is no less pitiful. Many of the birds that were once easily seen in rural areas are now on the verge of extinction. The number of birds such as siskins, doyles, babui, sparrows and many other species has decreased drastically. Chemical pesticides play a major role behind this. Birds survive by eating insects. But when those insects contain pesticide poison in their bodies, the birds themselves become sick after eating that poisoned food. Sometimes they die outright, and sometimes their reproductive capacity decreases. The eggshell becomes weak and the chicks cannot hatch. In addition, the use of chemicals is creating a food crisis for birds. Pesticides are killing not only harmful insects, but also beneficial insects. As a result, the food source of birds is decreasing.

Many birds are suffering from malnutrition and dying because they do not get the necessary food. In addition, the use of herbicides is destroying the surrounding vegetation and shrubs, which were essential for birds to build nests and shelter.

The harmful effects of chemicals are not limited to birds and butterflies. It is affecting the entire ecosystem. When pollinating insects decrease, crop production also decreases. When birds decrease, the number of insects increases uncontrollably. This again requires the use of more pesticides, thus creating a vicious cycle. Soil health also begins to deteriorate, because chemical fertilizers kill the natural fertility of the soil and the beneficial microorganisms present in the soil. Another important issue is the imbalance in the food chain. Birds and butterflies are not just individual species, they are part of a complex food chain. Butterflies and insects are food for many animals, while birds are food for larger predators. When one part of this chain is damaged, the entire chain is affected. Thus, biodiversity is threatened.

To improve this situation, we need to adopt sustainable methods in agriculture. Organic farming is a good alternative. In this, instead of chemical fertilizers and pesticides, cultivation is done through natural fertilizers, organic pesticides and crop diversity. Farmers need to be trained so that they understand that it is not right to do long-term harm for short-term gains. The government should also come forward and provide subsidies and support for organic farming. At the same time, we all need to be aware. City people can also use natural methods in their home gardens without spraying chemical pesticides. They can create a friendly environment for birds and butterflies by planting native trees and making flower gardens. Food and water can be provided for birds.

Birds and butterflies not only enhance the beauty of nature, they are an essential part of our ecosystem. Their extinction means our own loss. Because without a healthy environment, humans cannot survive. Therefore, it is the demand of the hour to reduce the use of chemicals in agriculture and adopt sustainable methods. Therefore, if we all work together to protect these small creatures, a beautiful, green and vibrant world will remain for future generations.

The writer is a student, Institute of Education and Research, Jagannath University

যুবদের উদ্যোক্তা হওয়া কমে যাচ্ছে কেন: বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র

জান্নাতুল ফেরদাউস অহনা

বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত এগোচ্ছে শিল্পায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও পরিষেবা খাতসহ নানা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলছে। সম্প্রতি এদেশের অর্থনীতিতে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ আগের মতো নেই। নানা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুবকদের একটি বড় অংশ নিরাপদ চাকরির দিকে ঝুঁকছে। শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তি সবই আগের চেয়ে বেশি সহজলভ্য হওয়ার পরও কেন এই অনীহা? বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা জরুরি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রাথমিক পুঁজি। বহু তরুণের নতুন ধারণা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ দিতে পরিবারভিত্তিক বিনিয়োগ বা সঞ্চয় থাকে না। কারণ, ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক বিনিয়োগ। অধিকাংশ তরুণই পরিবারভিত্তিক পুঁজির অভাবে ভোগেন। ব্যাংক ঋণ পেতে হলে প্রয়োজন জামানত, কাগজপত্র আর দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা নতুনদের জন্য বড় বাধা। স্টার্টআপ ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা সহজ শর্তে ঋণ এসব সুবিধা এখনো পর্যাপ্তভাবে পৌঁছায় না। আমাদের সমাজে স্থায়ী চাকরি এখনো 'নিরাপত্তা' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের অনেক পরিবারই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থির বলে মনে করে। ব্যবসা ব্যর্থ হলে পরিবার ও সমাজ দুই দিক থেকেই চাপ তৈরি হয়। ফলে বহু তরুণ মেধা ও ধারণা থাকা সত্ত্বেও চাকরিকে বেশি স্থিতিশীল মনে করেন।ফলে সমাজে চাকরিজীবী ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে সামাজিক মর্যাদার ধারণাও উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়। তরুণেরা ব্যর্থতার ভয় ও সামাজিক চাপে চাকরিকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাজার বোঝা, পরিকল্পনা তৈরি, পণ্য উন্নয়ন, হিসাব-নিকাশ, বিপণন এই সবকিছুতে দক্ষতা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্যোক্তা-শিক্ষা এখনও সীমিত। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম থাকলেও অনেক তরুণ এর নাগাল পান না।

একটি ব্যবসা শুরু করতে প্রয়োজন ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট নিবন্ধন, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিভিন্ন অনুমোদন এসব প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে দালালচক্র, অতিরিক্ত সময়, কিছু ক্ষেত্রে হয়রানি। অনলাইন সেবার সুযোগ বাড়লেও বাস্তবে জটিলতা পুরোপুরি দূর হয়নি। উদ্যোক্তা হওয়ার শুরুতেই এমন অভিজ্ঞতা অনেক তরুণকে নিরুৎসাহিত করে। বাজারের অনিশ্চয়তা ও তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। দেশি-বিদেশি পণ্য ও ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতা এতই বাড়ছে যে নতুন উদ্যোক্তারা বাজারে নিজেদের স্থায়ী করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বিশ্ববাজারের মন্দা, ডলারের ওঠানামা, আমদানি-রপ্তানির নিয়মে পরিবর্তন এসব কারণে অনেকেই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। ফলে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তরুণের মন পিছিয়ে যায়। একজন নতুন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অভিজ্ঞ কারও দিকনির্দেশনা। কিন্তু দেশে মেন্টরশিপ বা নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম সীমিত। নতুন উদ্যোক্তারা জানেন না কোথায় গেলে পরামর্শ পাওয়া যাবে, কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা যায়, কীভাবে বাজার বিশ্লেষণ করতে হয়। ফলে শুরুতেই একাকিত্ব ও অনিশ্চয়তা ভর করে। উদ্যোক্তা হওয়ার পথে ব্যর্থতা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যর্থতাকে লজ্জা হিসেবে দেখে। একবার ব্যবসায় ক্ষতি হলে পরিবারসমাজ এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় যে অনেক তরুণ দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার সাহস পান না। উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশে এই মানসিকতা বড় বাধা। উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা অনেক। এজন্য,প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা।বাংলাদেশের যুবসমাজ বিশ্বমানের আইডিয়া, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা রাখে। তাই উদ্যোগ কমে যাওয়ার এই প্রবণতা থামাতে হলে কিছু বিষয় জরুরি সহজ শর্তে স্টার্টআপ ফান্ড ও ঋণপ্রাপ্তি, উদ্যোক্তা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া, ব্যবসার নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া আরও সহজ করা, দেশের প্রতিটি জেলায় নেটওয়ার্কিং ও মেন্টরশিপ কেন্দ্র স্থাপন, পরিবার ও সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন, ব্যর্থতাকে উদ্যোক্তার শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। বাংলাদেশের তরুণদের হাতে অসীম সম্ভাবনা আছে। শুধু সঠিক সহায়তা ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা দেশের অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রাথমিক পুঁজি। বহু তরুণের নতুন ধারণা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ দিতে পরিবারভিত্তিক বিনিয়োগ বা সঞ্চয় থাকে না। কারণ, ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক বিনিয়োগ। অধিকাংশ তরুণই পরিবারভিত্তিক পুঁজির অভাবে ভোগেন। ব্যাংক ঋণ পেতে হলে প্রয়োজন জামানত, কাগজপত্র আর দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা নতুনদের জন্য বড় বাধা। স্টার্টআপ ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা সহজ শর্তে ঋণ এসব সুবিধা এখনো পর্যাপ্তভাবে পৌঁছায় না

লেখক: শিক্ষার্থী, লোকপ্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

নীরব আইনের ছায়ায় হারাচ্ছে পরিবেশ

তাকবির জাহান

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের পথ ধরে দ্রুত এগোচ্ছে। নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন– সবই দেশের সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলেছে। কিন্তু এই অগ্রযাত্রার ছায়ায় পরিবেশ ক্রমশ সংকটের মুখে পড়ছে। বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ সব ধরনের দূষণই মানুষের জীবনমানকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। একদিকে দূষণ দিন দিন বাড়ছে, অন্যদিকে আইন থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বাংলাদেশ আজ দাঁড়িয়ে আছে।

ঢাকার বায়ুদূষণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বিপর্যয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গবেষণার প্রতিবেদনে ঢাকা নিয়মিতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় উঠে আসছে। ধুলিকণা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ইটভাটা ও শিল্পকারখানার বর্জ্য সব মিলিয়ে মানুষের শ্বাস নেওয়া প্রতিদিনের ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী সবার জন্যই দূষণ হুমকিস্বরূপ।

> ঢাকার বায়ুদূষণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বিপর্যয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গবেষণার প্রতিবেদনে ঢাকা নিয়মিতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় উঠে আসছে। ধুলিকণা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ইটভাটা ও শিল্পকারখানার বর্জ্য সব মিলিয়ে মানুষের শ্বাস নেওয়া প্রতিদিনের ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী সবার জন্যই দূষণ হুমকিস্বরূপ

নদ-নদীর অবস্থা আরো উদ্বেগজনক। তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলী-কোনো নদীই দূষণমুক্ত নয়। শিল্পকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নদীকে মৃতপ্রায় করে তুলছে। মাছ ও জলজ প্রাণীর সংখ্যা কমছে, জলজ পরিবেশের ভারসাম্য ভঙ্গ হচ্ছে। নদীর দূষণ কেবল পরিবেশগত সমস্যা নয়; এটি সরাসরি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনমান এবং জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলছে।

শহরের শব্দদূষণও বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। যানবাহনের হর্ন, নির্মাণকাজ, লাউডস্পিকারসব মিলিয়ে শহরের নাগরিকরা এক অবিরাম শব্দসন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় শব্দদূষণ মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্রবণশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আইনের দিক থেকে দেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) শিল্পকারখানার ছাড়পত্র, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের বিধান এনেছে। দূষণ ঘটালে জেল-জরিমানা, স্থাপনা বন্ধের নির্দেশ এবং অন্যান্য শাস্তি বিধানও রয়েছে। তবে বাস্তবে আইন কার্যকর হচ্ছে না। অনেক দূষণকারী প্রতিষ্ঠান সামান্য জরিমানা দিয়ে একই অপরাধ পুনরায় করছে। জরিমানার পরিমাণ ক্ষতির তুলনায় অতি সামান্য হওয়ায় এতে কোনো প্রকৃত চাপ সৃষ্টি হয় না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে প্রশাসনও অনেক সময় আইন প্রয়োগে পিছিয়ে থাকে। ফলে আইন থাকলেও তার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ।

পরিবেশ আদালত আইন ২০১০-এর আওতায় বিশেষ আদালত স্থাপন করা হলেও কার্যক্রম প্রত্যাশিতভাবে সক্রিয় নয়। মামলা কম, বিচার ধীর এবং তদন্তের মান অনেক সময় দুর্বল। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬, জলাধার সংরক্ষণ আইন, পলিথিন ও প্লাস্টিক নিষিদ্ধবিধি এসব আইন মাঠপর্যায়ে দুর্বলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

প্রশাসনিক দুর্বলতার সঙ্গে জনগণের উদাসীনতাও যুক্ত। আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা, অকারণে হর্ন বাজানো, খোলা জায়গায় বর্জ্য পোড়ানো এসব আচরণও দূষণের অংশ। তাই শুধু আইন নয়, জনগণের সচেতনতা বাড়ানোও অপরিহার্য।

পরিবেশ রক্ষা এখন কেবল প্রশাসন বা আইন প্রণেতার দায়িত্ব নয়। এটি রাষ্ট্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সবাইকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ আদালত শক্তিশালী করা, দূষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দেওয়া, আধুনিক বর্জ্য শোধনাগার বাধ্যতামূলক করা, পরিবেশ অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করাএসব পদক্ষেপ অবিলম্বে নেওয়া জরুরি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। উন্নয়ন জরুরি, কিন্তু পরিবেশের বিনাশের বিনিময়ে কোনো অগ্রগতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আজ যদি প্রকৃতি ধ্বংস হয়, আগামীকাল দেশের উন্নয়নও থমকে যাবে। তাই দূষণ ও আইনের ছায়ায় আটকে থাকা বাংলাদেশকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি শুধু উন্নয়নের স্লোগান দেব, নাকি বাস্তবে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব?

পরিবেশ রক্ষা এখন কেবল নীতিকথা নয়; এটি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। আইনকে কার্যকর করে, সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং শক্তিশালী প্রশাসন নিশ্চিত করে আমরা বাংলাদেশের পরিবেশকে বাঁচাতে পারি। না হলে দূষণের কারণে হারাবে শুধু প্রকৃতি নয়ড়হারাবে আমাদের জীবনমান, স্বাস্থ্য এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎও।

লেখক: শিক্ষার্থী, আইন ও ভূমি প্রশাসন অনুষদ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ছায়ার নগরী সিঙ্গাপুর

তাপপ্রবাহের বিরুদ্ধে এক সবুজ যুদ্ধ

ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহে শহরগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এখন বিশ্বজুড়ে নতুন এক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে 'ছায়া'। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের নানা শহর প্যারিস থেকে শুরু করে ফিনিক্স সবাই ছায়া তৈরির কৌশল নিয়ে ভাবছে

নৌশিন তাবাসসুম
শিক্ষার্থী

সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়িক এলাকার সুউচ্চ ভবনের ছায়াই দুপুরের সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা। আবার রাতে সরকারি আবাসিক এলাকার সবুজ মাঠ শহরের অন্য যেকোনো বাণিজ্যিক এলাকার তুলনায় ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডা থাকে। তাপমাত্রা আর অসুস্থতার সরাসরি সম্পর্ক প্রমাণিত। তাই সবচেয়ে ছায়াঘেরা এলাকা আসলেই সবচেয়ে নিরাপদ। জলবায়ু পরিবর্তনের সব প্রভাব ঠেকানো সম্ভব না হলেও, ছায়াকেন্দ্রিক অবকাঠামো শহরকে অনেকটাই সহনীয় করে তুলতে পারে

বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহে শহরগুলো হিমশিম খাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হলো তীব্র গরম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা দাবানলের চেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় প্রচণ্ড তাপে। এর সবচেয়ে বড় শিকার শহরাঞ্চল। কারণ 'আরবান হিট আইল্যান্ড' প্রভাবের কারণে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় দ্বিগুণ হারে তাপমাত্রা বাড়ে। ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহে শহরগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এখন বিশ্বজুড়ে নতুন এক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে 'ছায়া'। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের নানা শহর, প্যারিস থেকে শুরু করে ফিনিক্স সবাই ছায়া তৈরির কৌশল নিয়ে ভাবছে। প্রখর গরমের দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর আগেই বুঝে গিয়েছিল শহরকে বাসযোগ্য রাখতে চাইলে ছায়ার বিকল্প নেই। ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর বহু আগেই বুঝে ফেলেছিল, মানুষের বেঁচে থাকা, উৎপাদনশীলতা আর নগরায়ণ টিকিয়ে রাখার মূল শর্ত হলো সর্বত্র ছায়া নিশ্চিত করা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ছোট্ট দেশটি ছায়াকেন্দ্রিক নগর পরিকল্পনায় এখন এক অনন্য উদাহরণ।

পাঁচ ফুটের পথ আর র‍্যাফলসের ভাবনা

সিঙ্গাপুরের ছায়া-সংস্কৃতির সূচনা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসক স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলসের হাত ধরে। ১৮২২ সালের প্রথম টাউন প্ল্যানে প্রতিটি রাস্তায় আচ্ছাদিত হাঁটার পথ রাখার বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেন। এই 'ফাইভ ফুট ওয়ে' বা পাঁচ ফুট প্রশস্ত বারান্দা পথ মানুষের জন্য হয়ে উঠেছিল বৃষ্টি ও ভাপসা গরম সামলানোর সহজ আশ্রয়। দোকান বা বাড়ির নিচ তলার ভেতর দিয়ে এগোনো যায় এমন এই পথচলতি গলিপথ দেখতে অনেকটা ইতালির বলোনিয়ার ঐতিহাসিক বারান্দাঘেরা রাস্তাগুলোর মতো। তবে এগুলোর জন্মভূমি আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই বলে মনে করেন গবেষকরা। সময়ের স্রোতে র‍্যাফলসের সেই 'ভেরানডা-ওয়ে' ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আসা লি কুয়ান ইউ আবার এই ধারণাকে আধুনিক রূপে ফিরিয়ে আনেন।

লি কুয়ান ইউ : ছায়ার জনক

ষাট দশকে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেওয়া লি শুধু রাজনীতিতে নয়, নগর পরিকল্পনায়ও ছিলেন খুঁতখুঁতে। আর্দ্র আবহাওয়াকে তিনি মনে করতেন অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার প্রধান শত্রু। ঘরের ভেতরে তিনি সিঙ্গাপুরকে গড়ে তোলেন 'এয়ার-কন্ডিশন্ড নেশন'-এ। বাইরে ছিলেন তিনি ছায়ার প্রতি আসক্ত। ভুল নকশার ফুটপাথ দেখলে তিনি কর্মকর্তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে গরম মাটিতে বসে প্রমাণ করতেন নকশা কতটা ব্যর্থ হয়েছে।

ষাট-সত্তর দশকে সরকারি আবাসন প্রকল্পের বহুতল ভবনগুলোর নিচ তলা খোলা রাখার নিয়ম চালু হয়, যেগুলো পরিচিত 'ভয়েড ডেক' নামে। এগুলো বাতাস চলাচলের সুযোগ তো দিলই, একই সঙ্গে মানুষের সামাজিক মিলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরবর্তী আশি-নব্বই দশকে সরকারি নির্দেশে নির্মিত হয় আলাদা ধাতব ছাউনি, যাতে মানুষ শুকনো পথ ধরে বাস বা ট্রেনে উঠতে পারে। আজ সিঙ্গাপুরে প্রায় ২০০ কিলোমিটারজুড়ে রয়েছে আচ্ছাদিত হাঁটার পথ। কল্পনা করুন, নিউইয়র্কের সাময়িক নির্মাণ-স্ক্যাফোল্ড যদি স্থায়ী হতো, সিঙ্গাপুরের ফুটপাথ অনেকটা তেমনই, তবে কার্যকরী ও দীর্ঘমেয়াদি।

এখানকার আইন অনুযায়ী, নতুন ভবনের মালিকদের বাধ্যতামূলকভাবে নিচ তলায় ৮ থেকে ১২ ফুট জায়গা রাখতে হয় ছাউনির জন্য। ফলে ভবনগুলোই ছায়ার অংশ হয়ে যায়। গবেষণা বলছে, ছাউনি দেওয়া পথে হাঁটলে রোদে হাঁটার তুলনায় পথকে প্রায় ১৪ শতাংশ ছোট মনে হয়। অর্থাৎ ছায়া শুধু আরাম নয়, মানসিকভাবেও যাত্রা সহজ করে তোলে।

সবুজ ছায়া বনাম কংক্রিটের ছাউনি

'আমরা এমন এক অঞ্চলে বাস করি যেখানে সবসময় প্রচণ্ড গরম আর আর্দ্রতা বিরাজ করে,' বলছিলেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার অধ্যাপক ইউন হে হোয়াং। সারা বছর তাপমাত্রা থাকে ৩১ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে, তাই তার মতে সিঙ্গাপুরে সবসময়ই ছায়া দরকার।

লিয়া রুফেনাখট, যিনি সরকার-সমর্থিত কুলিং সিঙ্গাপুর প্রকল্পে কাজ করেছেন, বলেন গাছ ছায়া দেওয়ার পাশাপাশি বাতাসে পানি ছাড়ে, যা সিঙ্গাপুরের ভাপসা আবহাওয়ায় আরও অস্বস্তি বাড়াতে পারে। তার মতে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো সবুজ ছায়া ও কংক্রিট ছাউনির সমন্বয়।

ডাউনটাউনের উচ্চ ভবনের ছায়া, ফুটপাথের ধাতব ছাউনি, আর পার্কের বৃক্ষের সমন্বয় গড়ে উঠেছে এক অনন্য ছায়া-নেটওয়ার্ক। শহরের আইন অনুযায়ী, প্রতিটি খোলা প্রাঙ্গায় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অন্তত অর্ধেক বসার জায়গায় ছায়া রাখতে হবে। সেটা হতে পারে গাছের, ছাতার, অ্যালুমিনিয়ামের ছাউনি, কিংবা পাশের কোনো টাওয়ারের ছায়া সবই বৈধ।

এখানে সিঙ্গাপুর ও নিউইয়র্কের পরিকল্পনা আইনেই পার্থক্য স্পষ্ট। নিউইয়র্কে ভবনের ছায়া যাতে জনসমাগমস্থলে না পড়ে, তা নিশ্চিত করা হয়। শীতল আবহাওয়ার কারণে তারা প্রাজা রাখে দক্ষিণমুখী, যাতে শীতকালে রোদ পাওয়া যায়। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরে প্রাজা পূর্বমুখী হলে ভালো, কারণ এতে বিকালের প্রচণ্ড রোদ থেকে মানুষ রক্ষা পায়।

লি কুয়ান ইউয়ের নেতৃত্বে গাছ শুধু পরবর্তী ভাবনার বিষয় ছিল না, বরং নগর পরিকল্পনার মূল অংশ। সত্তর দশকে যখন তিনি গাড়ি নির্ভরতা কমিয়ে গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তখন বাসস্টপ, ফুটপাথ, পার্ক—সবখানে গাছ লাগানো শুরু হয়। তার বিখ্যাত উক্তি 'মুল ঠিক আছে, তবে আমাকে আগে ছায়া দাও।' যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে যেমন বিদ্যুতের খুঁটি ও ঝুলন্ত তারের কারণে গাছ ছোট ও কৃত্রিমভাবে বসানো হয়, সিঙ্গাপুরে শুরু থেকেই সেগুলো মাটির নিচে নেওয়া হয়। ফলে গাছ বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি হয়।

'পার্কস অ্যান্ড ট্রিস' বোর্ডের বাজেট তার আমলে দশগুণ বাড়ানো হয়। শুধু রাস্তায় নয়, বেসরকারি ভবনেও গাছ বাধ্যতামূলক করা হয়। নতুন আবাসন প্রকল্পে ঘাসের লন, সবুজ আঙিনা, গাছপালা আর পার্ক সংযোগকারী পথ রাখতেই হতো।

সব শ্রেণির জন্য সমান ছায়া

লি কুয়ান ইউ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন মধ্যবিত্ত আর শ্রমজীবী এলাকায় ভিন্নতা করা রাজনৈতিক আত্মঘাতী হতো। তাই গাছ, ছায়া আর সবুজায়ন সবখানেই সমানভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। ফলাফল, আজ সিঙ্গাপুরের ধনী-গরিব সব এলাকাতেই ছায়া সর্বজনীন সম্পদ।

১৯৭৪ সালে শহরে গাছের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ ৫৮ হাজার। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ লাখে। একই সময়ে জনসংখ্যা বাড়ে তিন মিলিয়ন। অথচ দ্বীপের প্রায় অর্ধেক অংশ এখনও ঢাকা ঘাস, ঝোপ আর বৃক্ষরাজিতে।

প্রকৃতি, রাজনীতি আর ছায়ার সিম্ফনি

সিঙ্গাপুরের আবহাওয়া গাছ জন্মানোর জন্য আদর্শ। সারা বছর গড় তাপমাত্রা ৩১-৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর বৃষ্টিপাত ২ মিটারেরও বেশি। তবে শুধু প্রকৃতি নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিই এই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

লি কুয়ান ইউয়ের একনায়কসুলভ শাসন নিয়ে সমালোচনা থাকলেও ছায়াকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত শহরকে টেকসই করেছে। গণতান্ত্রিক শহরে যেখানে নীতি প্রশাসনভেদে বদলায়, সেখানে সিঙ্গাপুরে একটানা নেতৃত্ব ছায়াভিত্তিক পরিকল্পনাকে সফল করেছে।

বিশ্বের জন্য শিক্ষা

আজ সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়িক এলাকার সুউচ্চ ভবনের ছায়াই দুপুরের সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা। আবার রাতে সরকারি আবাসিক এলাকার সবুজ মাঠ শহরের অন্য যেকোনো বাণিজ্যিক এলাকার তুলনায় ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডা থাকে। তাপমাত্রা আর অসুস্থতার সরাসরি সম্পর্ক প্রমাণিত। তাই সবচেয়ে ছায়াঘেরা এলাকা আসলেই সবচেয়ে নিরাপদ। জলবায়ু পরিবর্তনের সব প্রভাব ঠেকানো সম্ভব না হলেও, ছায়াকেন্দ্রিক অবকাঠামো শহরকে অনেকটাই সহনীয় করে তুলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি বা হনলুলু কিংবা অন্য কোনো উষ্ণমণ্ডলীয় শহর চাইলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে একই কাজ করতে পারে। শর্ত একটাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর ধারাবাহিক নীতি।

সিঙ্গাপুর দেখিয়ে দিয়েছে, ঘনবসতিপূর্ণ নগরও হতে পারে ছায়া-ঢাকা আর সবুজে ভরা। ছায়ার এই নীতি কেবল আরামের জন্য নয়, বরং জনস্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা আর নগরের ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার অস্ত্র।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম অবলম্বনে

মতামত ■ অলোক আচার্য

কাজির গরু, কিতাব এবং ব্যর্থ কপ সম্মেলন

প্রতি বছরই বেশ আয়োজন করে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বড় বড় নেতারা সেই সম্মেলনে হাসিমুখে অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে পৃথিবী রক্ষায় কাগজে-কলমে চুক্তি করেন। এরপর অগ্রগতির প্রশ্ন উঠলেই পুরো আয়োজন আসলে কোনো কাজে আসে না! বছরের পর বছর এই দৃশ্য। অথচ এই সম্মেলন ঘিরে আগ্রহের শেষ থাকে না। প্রতি বছরই মনে হয় এবার মনে হয় হবে কিছু একটা। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই ফিরতে হয়। কার্বন নিঃসরণ কমাতে শিল্পোন্নত দেশগুলো স্বার্থ ভেঙে বের হয়ে আসতে পারবেন না। জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ ৩০-তে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি চুক্তি অবশ্য হয়েছে। সেই চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থসহায়তা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রায় দুই সপ্তাহের আলোচনার পর আয়োজক দেশ ব্রাজিল যে নতুন খসড়া প্রকাশ করেছে, তাতে 'ফসিল ফুয়েল' বা 'রোডম্যাপ'র কোনোটিরই উল্লেখ নেই। উদীয়মান অর্থনীতি ও ছোট দ্বীপরাষ্ট্রসহ মোট ৩৬টি দেশ ব্রাজিলকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে- তেল, গ্যাস ও কয়লা থেকে সরে যাওয়ার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া তারা কোনো চুক্তি মানবে না। প্রায় ২০০ দেশের ঐকমত্য ছাড়া কোনো চুক্তি সম্ভব নয়। এবারের সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র অনুপস্থিত- প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কপ৩০ এড়িয়ে গেছেন। ১০ নভেম্বর থেকে আমাজন নদীর মুখের কাছের বেলেম শহরে শুরু হওয়া কপ৩০-এর মূল লক্ষ্য ছিল গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের বিদ্যমান কাঠামোকে শক্তিশালী করা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভুক্তভোগী ৮০টির বেশি দেশ ও অঞ্চল এবারে চুক্তিতে জ্বালানি তেল, কয়লা ও গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে স্পষ্ট রূপরেখা চেয়েছিল। সৌদি আরব ও রাশিয়ার মতো শীর্ষ জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন ও রপ্তানিকারক দেশগুলো সম্মেলনের শুরু থেকে এই দাবির বিরোধিতা করে আসছিল। শেষ মুহূর্তে এটা নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়। এবার বর্ধিত সময়ে যে চুক্তি হয়েছে, তাতে জীবাশ্ম জ্বালানি ধীরে ধীরে কমানোর একটি রূপরেখা নিয়ে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বন নিধন বন্ধ করা নিয়ে রূপরেখায় কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এই চুক্তি মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে কোনো আশা প্রদাণ করতে পারে না। কারণ চুক্তিতে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই এবং চাইলে এখান থেকে সরে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ এতকিছুর পর সেই কাজির গরু গোয়ালেই থেকে গেল, বাস্তবতার নিরিখে কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত হলো না।

বিশ্বের যেসব দেশের কারণে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের সেখান থেকে বেরিয়ে টেকসই পরিবেশ গড়ায় মনোযোগী হতে হবে। শিল্পের যাতাকলে পৃথিবীর অবস্থা আজ অত্যন্ত দুর্বিষহ। যদি তারা এবারও ব্যর্থতার পরিচয় দেন বা অসহযোগীতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করেন তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্ব মূলত আরো বেশি সংকটাপন্ন অবস্থায় চলে যাবে। যেখান থেকে ফিরে আসা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। এককথায় বলা যায়, ব্যর্থ হলে পৃথিবী নামক এই গ্রহের ধ্বংস অনিবার্য

১৯৯৫ সালে প্রথম কপ সম্মেলন হয়। গত বছর সম্মেলন থেকে ঘোষণা দেয়, ২০৩৫ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে সহায়তা করবে। ১৯৯৯ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে 'জলবায়ু পরিবর্তন' ইস্যুটি প্রথমবারের মতো সামনে আসে। আজ থেকে দুইশ বছর আগে ব্রিটেনে শুরু হয়েছিল শিল্প বিপ্লব। এই শিল্প বিপ্লবের মূলে ছিল কয়লা। ১৭ অক্টোবর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে ওঠে এসেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বের ১০৯টি দেশের ৬৩০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১১০ কোটি মানুষ (প্রায় ১৮ শতাংশ) চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ভুগছে। সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি মানুষ, যা মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ। 'পোভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (ওপিএইচআই)' এর যৌথ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৮৮ কোটি ৭ লাখ মানুষ অন্তত একটি জলবায়ু সমস্যার সরাসরি সমুখীন। এর মধ্যে ৬০ কোটি ৮ লাখ মানুষ চরম তাপে, ৫৭ কোটি ৭ লাখ দূষণে, ৪৬ কোটি ৫ লাখ বন্যায় এবং ২০ কোটি ৭ লাখ খরায় ভুগছে। প্রায় ৬৫ কোটির বেশি মানুষ অন্তত দুই ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ কোটির বেশি মানুষ তিন বা চার ধরনের বিপদের সমুখীন এবং ১ কোটি ১ লাখ মানুষ এক বছরে সব চারটি বিপদই অনুভব করেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সাহারার দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষ দারিদ্র্যের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চরম তাপমাত্রা, খরা, বন্যা ও বায়ুদূষণ- এই চারটি জলবায়ু ঝুঁকির কারণে এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে কয়লা। গত বছর জলবায়ু সম্মেলনে দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধে একটি খসড়া চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সামনে আরেকটি জলবায়ু সম্মেলন। এর আগেই একটি চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটেন। ব্রিটেন থেকে যে শিল্প বিপ্লবের শুরু হয়, সেখান থেকেই নতুন পথের যাত্রা শুরু হয়েছে। ২০০ বছর আগে যে দেশে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল, এর মধ্য দিয়ে সেখানে কয়লা যুগের অবসান ঘটতে চলেছে। কয়লার বদলে দেশটি প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। ধনী দেশগুলোর বৈশ্বিক ক্লাবের মধ্যে ব্রিটেনই প্রথম কয়লা থেকে সরে আসছে। ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের গতি মন্থর করার চেষ্টায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম একটি মাইলফলকে পৌঁছাচ্ছে যুক্তরাজ্য। অন্য জি-সেভেন দেশগুলোর মধ্যে ইতালি ২০২৫ সালের মধ্যে, কানাডা ২০৩০ সালের মধ্যে এবং জার্মানি ২০৩৮ সালের মধ্যে কয়লা থেকে সরে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই পরিকল্পনার অগ্রগতি কপ-৩০ এ জানতে চাইতে পারে।

কয়েক বছর ধরই নতুন অর্থায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছিল জাতিসংঘ। উন্নয়নশীল দেশগুলো এই লক্ষ্য চূড়ান্তের অপেক্ষায় আছে। চরম আবহাওয়ার কারণে ২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে বলে ওঠে এসেছে। বিশেষত আকস্মিক বন্যা এবং অব্যাহত খরাসহ বৈরী আবহাওয়ার কারণে গত দুই বছরে ৪৫১ বিলিয়ন (৪৫ হাজার ১০০ কোটি) ডলার ক্ষতি হয়েছে। ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে, যেখানে ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। এরপর চীন ও ভারত অবস্থান করছে, যেখানে যথাক্রমে ২৬ হাজার ৮০০ কোটি ও ১১ হাজার ২০০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। সবার দৃষ্টি কপ-৩০-এর দিকে। এই এজেন্ডা নিয়েই এবছর জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী চলমান জলবায়ু সংকট মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক উৎস থেকে উন্নত দেশগুলোর প্রতি বছর ৫০০ বিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এটি এমন এক সময় যখন এই উষ্ণায়নের মাত্রা কমাতেই বিশ্ব নেতারা একত্রিত হচ্ছেন। স্টেট অব দ্য ক্লাইমেট রিপোর্টে' বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এক ভয়ংকর চিত্র হাজির করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, তাপমাত্রা রেকর্ড শুরু হওয়ার পর ২০১৫-২০২৪ সবচেয়ে উষ্ণ দশক। বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা একটানা ১৬ মাস ধরে (জুন ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪) সম্ভবত আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রায়শই ব্যবধান বাড়ছে। ২০১৫ সালের কপ ২১ জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ সম্মত হয় প্যারিস চুক্তিতে। যার লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক উষ্ণতাকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ করা এবং দেড় ডিগ্রিতে আটকে রাখা। ওয়ার্ল্ড মেটারোলজিক্যাল অরগানাইজেশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আপাতত দেড় ডিগ্রি থ্রেশহোল্ড পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব মনে হচ্ছে না। যাকে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতা বলা যায়। দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রায় এক দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে না। আমাদের মূল লক্ষ্য তাপমাত্রা কমানো। কিন্তু সেই তাপমাত্রা আদৌ কমছে না। বরং গবেষণা আরো ভয়ঙ্কর তথ্য দিচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে না পারলে শতাব্দী শেষে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ৩ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির পরিবেশ কর্মসূচির একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন কোনো একক ইস্যু নয় যে তা এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তবে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোই বেশি। এর ক্ষতির শিকার হচ্ছে বাংলাদেশও। এডিবির তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বার্ষিক গড় ক্ষতি প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। জলাবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৪০ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০) বাস্তবায়ন ও জলবায়ুকেন্দ্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে এই ঋণ অবদান রাখবে বলে মনে করে সংস্থাটি। বিশ্বের যেসব দেশের কারণে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের সেখান থেকে বেরিয়ে টেকসই পরিবেশ গড়ায় মনোযোগী হতে হবে। শিল্পের যাতাকলে পৃথিবীর অবস্থা আজ অত্যন্ত দুর্বিষহ। যদি তারা এবারও ব্যর্থতার পরিচয় দেন বা অসহযোগীতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করেন তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্ব মূলত আরো বেশি সংকটাপন্ন অবস্থায় চলে যাবে। যেখান থেকে ফিরে আসা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। এক কথায় বলা যায়, ব্যর্থ হলে পৃথিবী নামক এই গ্রহের ধ্বংস অনিবার্য।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক
sopnil.roy@gmail.com

COP30 Ends with Lofty Declarations but Limited Gains for Bangladesh

Shah Adnan Mahmood

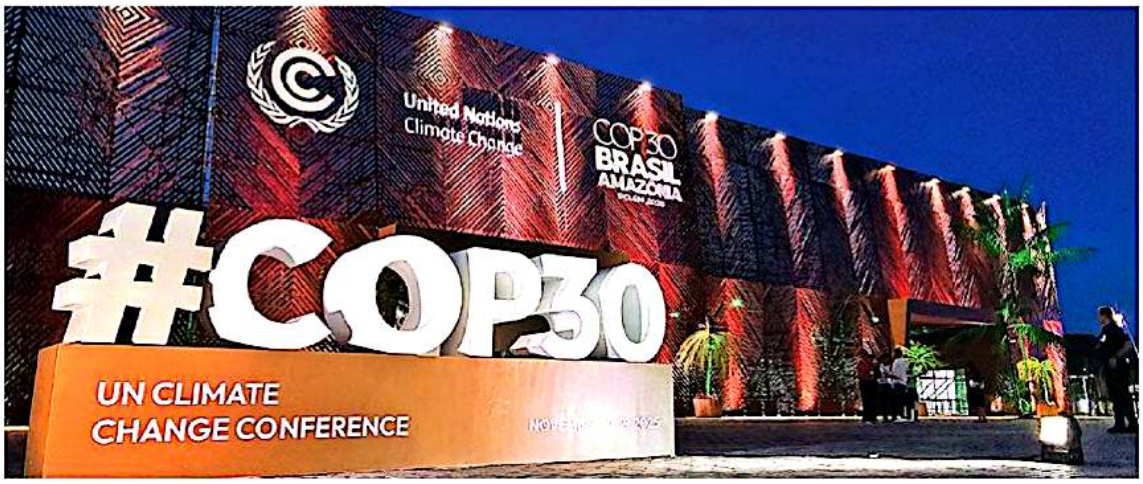

The COP30 climate summit in Belém, Brazil, concluded with sweeping declarations on adaptation, forests, and just transition, yet for climate-vulnerable nations like Bangladesh, many of the most critical expectations remain unmet, leaving experts to describe the outcomes as "progressive in language, weak in delivery". Bangladesh entered the conference demanding predictable, grant-based climate finance, a clear global roadmap to phase out fossil fuels, and substantial commitments to the Loss and Damage (L&D) fund. But as negotiations wrapped up, the overall sentiment from Dhaka's delegation was cautiously optimistic at best.

Major Declarations: Progress, but mostly on paper

The summit delivered several headline-grabbing commitments, including a global framework on Just Transition, a political pledge to triple adaptation finance by 2035, and new initiatives on forests, methane reduction, and indigenous rights. According to COP30 outcome documents, the Just Transition Declaration aims to ensure rights and livelihoods of workers and vulnerable communities as countries shift away from fossil fuels. Diplomats say the framework could help Bangladesh access support for labour-market adjustments in emerging green industries. Adaptation finance also received heightened attention, with negotiators agreeing to the goal of "at least tripling" funding within the next decade. For a delta nation that requires billions annually to strengthen embankments, restore river systems, and protect coastal populations, this recognition was welcomed though details remain unclear. New forest-focused financing mechanisms, including the Tropical Forest Forever Facility, also gained momentum. While not directly targeted at Bangladesh, they are expected to influence global climate finance flows and could shape future South-South cooperation.

Loss and Damage: Symbolic, but far from sufficient

One of the most watched items for Bangladesh was the financing of Loss and Damage, money intended to compensate for irreversible climate impacts such as salinity intrusion, river erosion and land loss. The summit saw a fresh pledge of around $250 million to the L&D fund. However, climate finance analysts, including Bangladeshi observers present at Belém, termed the amount "largely symbolic" against the needs of developing nations, which run into hundreds of billions annually. Many negotiators also raised concerns that a significant share of climate finance continues to arrive in the form of loans, not grants. Several civil-society groups warned that climate-vulnerable countries are being pushed into deeper debt to adapt to a crisis they did not create.

Fossil Fuel Phase-out: No roadmap despite strong global push

Despite support from more than 80 countries, COP30 failed to secure a binding global commitment or timeline for phasing out fossil fuels. Instead, negotiators introduced the "Mutirão" cooperative pact, urging nations to work collectively toward reducing emissions. For Bangladesh, which contributes less than 0.5% of global emissions but suffers disproportionately from their effects, the absence of a phase-out roadmap is a major setback.

Private-sector engagement still disappointing

Throughout the summit, several speakers from Africa, Asia, and island states criticized global corporations for failing to mobilise adequate adaptation and resilience finance. Sierra Leone's environment minister bluntly accused the private sector of "not working for adaptation" and called for polluters to pay into climate funds. Bangladesh's delegation echoed this frustration, noting that private-sector involvement remains minimal both globally and domestically.

What COP30 means for Bangladesh

With rising seas threatening to displace millions, salinity creeping farther inland each year and cyclones intensifying, Bangladesh's climate needs are immediate and mounting. Experts say Bangladesh will have to push hard in the months ahead to convert COP30's broad commitments into actionable financial flows.

Key implications include:

- Adaptation finance remains uncertain: The tripling target lacks a defined baseline, annual milestones, and clarity about grant-based delivery.
- Debt exposure continues: Loans, not grants, dominate climate finance, posing risks for Bangladesh's economy.
- Loss & Damage remains underfunded: The symbolic fund injection will not meaningfully address the scale of losses faced by countries like Bangladesh.
- Opportunities in Just Transition: Bangladesh can leverage the new framework to seek financing for renewable energy expansion, skill development and coastal resilience.
- Implementation gap persists: Without clear accountability mechanisms, many COP pledges may remain unfulfilled.

A mixed verdict: "More than words, less than needed"

Bangladesh's climate policy community largely described COP30 as a "mixed outcome." The summit produced strong political messages, but the absence of binding commitments, clear financial baselines, and long-term timelines leaves vulnerable countries uncertain. In the words of one Bangladeshi climate economist: "Belém delivered declarations, not deals." As COP31 preparations begin, Dhaka's priority will be pushing donor countries to turn words into measurable financing, while strengthening domestic resilience to cope with climate impacts that are already accelerating.

The writer is a certified expert in climate and renewable energy finance and Co-Founder, KLIFIN